উৎসর্গ

প্রয়াত বিমল সিংহ

ও

প্রয়াত তলবাংহা রিয়াং

যাদের সাহায্য, সহযোগিতা ছাড়া
লংতরাই ছবি তৈরী করা যেতো না

কিছু কথা

১৯৫২ সালে পন্ডিত জওহর লাল নেহেরুর আগরতলা সফর ক্যামেরা বন্দী করার ঘটনাকে যদি ত্রিপুরায় চলচ্চিত্র নির্মানের গোড়া পত্তন বলে ধরে নেয়া যায়, তাহলে আজ পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে সে বিষয়ে পর্যালোচনা করা যেতে পারে। দীর্ঘ এই সময়ে নানা বিষয়ে বিভিন্নভাবে চলচ্চিত্র অনুরাগীরা প্রধানত নিউজরীল তৈরীর মাধ্যমে তাদের কর্মকান্ড চালিয়ে গেছেন। পাশাপাশি বিক্ষিপ্তভাবে কখনও সরকারী অর্থানুকুল্যে আবার ব্যক্তিগত উদ্যোগে হাতে গোনা কিছু তথ্যচিত্র নির্মাণও হয়েছে। এরই সাথে কাহিনীচিত্র নির্মাণের পরিকল্পনা নেয়া হলেও নানা কারণে সম্ভব হয়নি। প্রকৃত পক্ষে কাহিনীচিত্র তৈরীর প্রচেষ্টা শুরু হয় লংতরাই ছবি থেকে। লংতরাই ছবি শুধুমাত্র ককবরক ভাষার প্রথম ছবি নয় ত্রিপুরা রাজ্য থেকে নির্মিত প্রথম কাহিনীচিত্রও বটে। লংতরাই ছবির সাফল্য সে সময় অনুপ্রাণিত করেছিল এই রাজ্যের অনেককে। ঐ সমস্ত চলচ্চিত্র অনুরাগীদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তী সময় চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রক্রিয়ায় জড়িয়ে পরেন। পরবর্তী প্রায় দশ বারো বছর ধরে এই ধরনের কর্মকান্ড চলতে থাকে। সে সময় ককবরক, বাঙলা উভয় ভাষায় বেশ কিছু চলচ্চিত্র সৃষ্টি হয়। এই সকল সৃষ্টি কাজের ফলশ্রুতিতে আমরা একদল আগ্রহী যুবক-যুবতী পেয়েছি যারা পরবর্তী সময় চলচ্চিত্র বিষয়ে পড়াশোনা করে নিজেদের শিক্ষিত করে তুলেছেন। শুধু তাই নয়,এখানকার চলচ্চিত্রে অভিনয় করে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এখানকার অভিনেতারা তাদের অভিনয় দক্ষতার ছাপ রেখেছেন। এর ফলে অভিনয়ের ক্ষেত্রে যে এক সুদুরপ্রসারী প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে সেকথা অস্বীকার করা যায় না।

চলচ্চিত্র চর্চার ক্ষেত্রে ত্রিপুরা রাজ্যের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আশি ও নব্বুই এর দশকের কিছুটা সময় পর্যন্ত যে সাড়া জেগেছিল তা ক্রমশ মুখ থুবরে পড়ে গেল। ধারাবাহিকতা বজায় রাখা গেল না। সেলুলয়েড-এর দিন যেন ফুরিয়ে গেল। এখন আর সেলুলয়েড মাধ্যমে চলচ্চিত্র নির্মাণের কথাও বিশেষ শোনা যায় না। তবে চিত্রটা ভিডিওগ্রাফির ক্ষেত্রে আশাব্যঞ্জক। ভিডিও ক্যামেরার সহজলভ্যতা ও পোষ্ট

প্রডাকসনের ঝুঁকি কম হওয়া ইত্যাদি সব কারণের ফলে মাধ্যমটি যথেষ্টই জনপ্রিয়তা **লাভ করেছে**। সেলুলয়েড ও ভিডিও মাধ্যম দুটি ভিন্ন হলেও নির্মাণের ব্যাকরণ **প্রধানত অভিন্ন হওয়ার ফলে** চলচ্চিত্র বিষয় চর্চা আসলে চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে **যথেষ্ট ইতিবাচক লক্ষণ** রূপে **বিবেচিত** হতে পারে। সেক্ষেত্রে চলচ্চিত্র সংক্রান্ত কর্মকান্ডের গতিবিধি **একটু শ্লথ হলেও** খুব একটা নিরাশাজনক নয় বলেই মনে হয়।

আমাদের দেশে এই সময়ে আঞ্চলিক চলচ্চিত্র যা কিনা প্রকৃত ভারতীয় জীবনবোধ ও দর্শনের দর্পণরূপে স্বীকৃত সে সকল সৃষ্টিকর্ম আজ ভীষণভাবে সঙ্কটগ্রস্ত। সেই সঙ্কট থেকে উত্তরণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কেরল সরকার ও আসাম সরকার সেখানকার চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে জড়িত মানুষের পন্থা পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য মিলিতভাবে প্রচেষ্টা নিচ্ছেন। অন্ততঃপক্ষে ছবি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে আদান প্রদান এমনকি এক ভাষার ছবিকে ডাবিং করে অন্য ভাষা অঞ্চলে প্রদর্শনের চিন্তা ভাবনা শুরু হয়েছে। এই সব বিষয়ে উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রেক্ষিতে আমার ভাবনা চিন্তা বিভিন্ন সময় চলচ্চিত্র চিন্তা নামে প্রকাশ পেয়েছে। সেগুলো এখানে সংকলিত হয়েছে। সেই সঙ্গে আরও কিছু চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধ নিয়েই এই সংকলন গ্রন্থটি। প্রবন্ধগুলো বিভিন্ন সাময়িকীতে প্রকাশিত তারিখের ক্রম অনুসারে সাজানো হয়েছে। আর এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে 'লংতরাই' ছবির চিত্রনাট্য।

লংতরাই ছবি যে ভাবে যে পরিবেশে তৈরী হয়েছে সেই প্রেক্ষিতে আমার মনে হয় লংতরাই প্রকৃত অর্থে জনগণের ছবির রূপ নিয়েছে, যেখানে প্রতিটি মানুষ তার সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। ভাষা,ধর্ম, পেশার বাধা অতিক্রম করে শুধুই মানুষ বিশেষ করে সাধারণ মানুষের সহযোগিতাই সম্ভব করেছে ত্রিপুরার মত প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আঞ্চলিক ভাষায় ছবি তৈরী হতে। সে কারণে 'লংতরাই' শুধুমাত্র একটি ছবি নয় আমার কাছে। লংতরাই আমাকে প্রান্তিক সীমানার বাইরে বাস করা অগুনতি মানুষের জীবন সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করাই নয় শুধু সে সম্বন্ধে শিক্ষিত হতে সাহায্য করেছে। লংতরাই সম্ভবত প্রথম সেই ছবি যেখানে জুমিয়া যাদের আমি প্রকৃত সর্বহারা বলে মনে করি। তারাই অভিনয় করেছেন সেই সুযোগ করে দেয়ার জন্য প্রয়াত বিমল সিংহ-এর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

'লংতরাই' এর চিত্রনাট্য ও 'চলচ্চিত্রচিন্তা' প্রবন্ধগুলো এক সূত্রে গেথে ছাপার দায়িত্ব হাতে নিয়ে 'অক্ষর' চলচ্চিত্র সম্পর্কে প্রথম প্রকাশনার কাজটি করতে এগিয়ে এলেন। এই সংকলন গ্রন্থের সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গত কারণেই জড়িয়ে রয়েছে আরও সব পরিকল্পনা। চলচ্চিত্র চর্চার ক্ষেত্রে আমাদের এই সীমাবদ্ধ প্রয়াস যদি কিছুটাও সাহায্য করে তাহলেই এই সংকলন প্রকাশ সার্থক হয়েছে বলা যাবে।

পরিশেষে, আমার চলচ্চিত্র বোধ যে সকল মহান স্রষ্টার সৃষ্টি ও লেখা পাঠ করে গড়ে ওঠেছে তাদের প্রত্যেকের প্রতি জানাই বিনম্র কৃতজ্ঞতা।

সূচীপত্র

শতবর্ষের চলচ্চিত্র

শতাব্দী প্রাচীন চলচ্চিত্র আজ আর মানুষকে বিস্ময়ে হতবাক করে না। সৃষ্টির আদিলগ্নে চিত্রটি কিন্তু এত নিরুত্তাপ ছিল না। স্থিরচিত্র থেকে মুভি পিকচার্সে উত্তরণের প্রতিটি ধাপ ছিল শিহরণ আর উত্তেজনায় পরিপূর্ণ। নিত্য নতুন আবিষ্কার নিজ নামে দ্রুত প্যাটেন্ট করিয়ে নেয়ার জন্য বিজ্ঞানীদের মধ্যে ছিল অসম্ভব প্রতিযোগিতা। ল্যু-মিঁয়র ভ্রাতৃদ্বয়ের প্যারিসে প্রথম প্রদর্শনীর দিন থেকে চলচ্চিত্রের যাত্রার যে শুরু হয়েছিল তারও বহু পূর্বে মানুষের মনে চলমান চিত্র সৃষ্টির তাগিদ অনুভূত হয়েছিল। চলচ্চিত্র মাধ্যমটি শৈল্পিক সুষমায় বিকশিত হয়ে ওঠার পেছনে যে জিনিষটি মুখ্য ভূমিকা পালন করে তা হলো ফটোগ্রাফি। যার জন্য প্রয়োজন একটি ক্যামেরা। স্থিরচিত্র থেকে উত্তরণের জন্য প্রথমেই তাই প্রয়োজন একটি ক্যামেরা। যা মূলতঃ বিজ্ঞান। যার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আলো, গতি, মানুষের চোখ এবং চলমান দৃশ্য সম্পর্কে তার মস্তিষ্কের প্রতিক্রিয়া। টলেমি বলেছিলেন চোখ সর্বদাই দেখে, যে কোন জিনিষ সরিয়ে নিলেও এক মিনিটের কয়েক মুহূর্ত সময় দেখতে পায়। দৃশ্যবস্তু সরিয়ে নিলেও তাই দেখা যায়। এই সূত্র ধরে রজেট তার পার্সিসটেন্স অফ ভিসান তত্ত্বের গবেষণায় বললেন দ্রুত চলমান আলাদা, আলাদা জিনিষকে ভাগ করতে মানুষের মস্তিষ্ক অক্ষম। চলচ্চিত্র আবিষ্কারের ক্ষেত্রে যা উল্লেখযোগ্য। নিরন্তর মানুষ গবেষণা করতে লাগলেন স্থিরচিত্র থেকে চলচ্চিত্র সৃষ্টির পন্থা উদ্ভাবনের। ১৮৭২ সালে ইংরেজ ফটোগ্রাফার ই. জে. মেব্রিজকে লাফাবার সময় ঘোড়ার পায়ের অবস্থান পর্য্যবেক্ষণ করার জন্য নিযুক্ত করলেন এক মার্কিনি রেসের ঘোড়ার মালিক। মেব্রিজ এক্সার ক্যামেরা সাজালেন আর প্রত্যেকটার শাটারের সঙ্গেই জুড়ে দিলেন সরু তার। এবার লাফানো অবস্থায় ঘোড়া ও জকির ছবি নেয়া হলো। ঘোড়া লাফাবার সঙ্গে সঙ্গে তার ছিঁড়ে যেতে লাগলো আর একের পর এক শাটারও বন্ধ হয়ে যেতে লাগলো। সেই প্রথম সত্যিকারের চলচ্চিত্র। এই পদ্ধতির ফলশ্রুতি মুভি ক্যামেরা। ক্যামেরার পর প্রয়োজন হলো তার সঙ্গে মানানসই নেগেটিভের। এই সময়ে সেলুলয়েডের ওপর সিলভার ব্রোমাইড জেলোটিনের দ্রবণ ব্যবহার করে বিরাট সফলতা লাভ করলেন বিজ্ঞানীরা। এদের নিরন্তর গবেষণার ফসল সেলুলয়েডে ফিল্ম ষ্ট্রিপ। নিউ ইয়র্কের তরুণ ব্যাঙ্ককর্মী জর্জ ইষ্টম্যান চাকরি ছেড়ে যে কোম্পানী

খুলেছিলেন সেই ইষ্টম্যান কোম্পানী, কোডাক নামে নেগেটিভের এক বিপুল সম্ভার নিয়ে হাজির হলেন। প্রায় একই সময়ে ফরাসী প্রযুক্তিবিদ এল এল এ লা প্রিন্সও বাজারে নিয়ে এলেন উপযুক্ত নেগেটিভ। এবার প্রয়োজন হয়ে পড়লো প্রদর্শনের। এই সময়টাতে পৃথিবী জুড়েই চলছিল গবেষণা। গবেষণা করেন বহু, কিন্তু সফলতা লাভ করেন মুষ্টিমেয়। ঠিক সেরকম ফ্রান্সে অগস্তে ও ল্যু মিয়ের যারা পরবর্তীকালে ল্যু-মিয়ের ব্রাদার্স নামে পরিচিত তাদের লিয়র কারখানায় বানালেন সিনেমাটোগ্রাফে। ১৮৯৫ তে তাঁবা প্রথম প্রাইভেট শো শুরু করেন। সে বছরের ডিসেম্বরে প্যারিসে বাণিজ্যিক প্রদর্শন শুরু হয়ে যায়। বিজ্ঞানের সংগে যুক্ত হয়ে গেলো বাণিজ্য। ফরাসী বিজ্ঞানী আন্তনি ল্যু-মিয়রের ছেলেরা প্রথম শুকনো প্লেট তৈরী করেন পরে গোটানো যায় এমন ফিল্মও তৈরী করেন। ফটো কেমিষ্ট্রি ও ফটো ডেভেলপমেন্টে মূল্যবান অবদানের জন্য লুইকে রয়েল ফটোগ্রাফিক সোসাইটি ১৯০৯ সালে স্বর্ণপদকে ভূষিত করে। মোশন পিকচার তৈরীর জগতে এবার প্রবেশ ঘটলো অভিনয়ের। অভিনয় শিল্পের হাত ধরে শিল্প কলার সমস্ত বিভাগ ধীরে ধীরে অন্তর্ভূক্ত হলো চলচ্চিত্র নামক আধুনিক এই মাধ্যমটিতে। অল্পদিনের মধ্যেই নির্বাক থেকে উত্তরণ ঘটলো সবাক সিনেমায়। কথা বলিয়ে, সুর দিয়ে প্রতিভা বিকাশের আরো সুযোগ সৃষ্টি করা হলো। দর্শকদের মধ্যেও এর আবেদন বেড়ে গেলো বহুগুণ। আধুনিক বিশ্বে বিজ্ঞান শিল্প ও বাণিজ্যের সহাবস্থানে প্রতিনিয়ত নবরূপে উন্মোচিত এই মাধ্যমটির প্রভাব অপরিসীম। সৃষ্টির সেই শুরু থেকে এই মাধ্যমটিকে শৈল্পিক রীতি নীতিতে ব্যবহার করার জন্য যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সময়ে মননশীল স্রষ্টারও আবির্ভাব হয়েছে যাদের নিরলস প্রচেষ্টায় তৈরী হয়েছে সিনেমার ব্যাকরণ, তার নিজস্ব ভাষা। এই সমস্ত বিরল প্রতিভার অধিকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আইজেনষ্টাইন। চলচ্চিত্র তৈরীর সাথে সাথে ধারাবাহিকভাবে এই মাধ্যমটির সংগে জড়িত বিষয়সমূহ নিয়ে তিনি রচনা করেছেন অমূল্য সব প্রবন্ধ। সেরগেই মিখাইলোভিচ আইজেনষ্টাইন পরিচালিত ছবিগুলি চলচ্চিত্রের প্রকাশ ক্ষমতাকে বহুদূর প্রসারিত কবেছে। শতবর্ষ অতিক্রান্ত চলচ্চিত্রে সম্ভবতঃ তিনিই সবচেয়ে বেশী প্রভাব ছড়িয়েছেন। ১৯২৪ সালে নির্মিত তাঁর প্রথম ছবি 'ষ্ট্রাইক' থেকে ১৯৪৮ সালে নির্মিত তাঁর শেষ ছবি ইভান দ্য টেরিবল পর্যন্ত প্রত্যেকটি ছবি বিভিন্ন প্রদেশের ভিন্ন ভাষার সংস্কৃতির মানুষকে আলোড়িত করেছে। মাত্র ২৬ বৎসর বয়সে ব্যাটলশীপ পোটেমকিন তাঁকে একজন বড় চলচ্চিত্রকার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাঁর পরিচালিত আটটি ছবিই চলচ্চিত্রের সাথে জড়িত বিষয়সমূহের স্তর উন্নত করতে সাহায্য করেছে। দি ফিল্ম সেন্স ও ফিল্ম ফর্ম নামে দুটো বই আজো চলচ্চিত্রের ধ্যান, ধারণা তৈবীর ক্ষেত্রে অপরিহার্য। শুধু ফিল্ম নিয়েই নয় শিল্প, সৃষ্টি কর্ম, বস্তুর চরিত্র নিয়েও তাঁর লেখা রয়েছে। সাইকোলজি অফ কমপোজিশন এমনি এক রচনা যা প্রায় সব ধরনের শিল্পীর অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়। তাঁর বহু রচনা মূল রুশেও প্রকাশিত হয়নি এবং তাঁর চেয়ে আরো কম লেখা অনূদিত হয়েছে। তিনি চেয়েছিলেন চলচ্চিত্রের ভাষায় তাঁর ছাত্রদের সমৃদ্ধ করে যেতে। তিনি বিশ্বাস করতেন রাশিয়ার জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও সমাজ সংস্কারের পথ প্রদর্শক হিসাবে চলচ্চিত্রকে ব্যবহার করবে। কারণ আইজেনষ্টাইনের কাছে চলচ্চিত্রের বিষয় হিসাবে তাই গুরুত্ব পেতো যা সমাজ জীবনে সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বহন করে। 'অক্টোবর' ছবিতে ঈশ্বরদের দৃশ্যে প্রথম তিনি 'মন্তাজ' নিয়ে পরীক্ষা করেন। তাঁর নিরীক্ষা 'ব্যাটলশিপ পোটেমকিন' ও 'ইভান দ্য টেরিবল' ছবিগুলিতে সাফল্যের সঙ্গে মন্তাজেব

জন্ম দেয়। চলচ্চিত্র ভাষার বিকাশের ক্ষেত্রে নিরলস শিক্ষক আইজেনষ্টাইন তাই চিরস্মরণীয়।

চলচ্চিত্র ভাষার বিকাশের পরীক্ষা নিরীক্ষার ক্ষেত্রে যে সৃষ্টিগুলো দিকচিহ্ন স্বরূপ স্বীকৃতি পেয়েছে তা হলো-

১. সিনেমাকে এপিক বা মহাকাব্যিক মাত্রায় সার্থক ব্যবহার করেছেন গ্রিফিথ তাঁর 'বার্থ অফ এ নেশন' ইনটলারেন্স, এবং আইজেনষ্টাইন তাঁর 'অক্টোবর' ছবিতে।

২. একটি চরিত্রের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে সিনেমার ব্যবহার করেছেন পুদোভকিন তাঁর 'মাদার' ছবিতে ও ড্রেইয়ার দ্য প্যাশন অফ জোয়ান অফ 'আর্ক' ছবিতে।

৩. সিনেমার কাব্য ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠা করেছেন আর্থ ছবিতে দোভ শেংকো।

৪. ফর্মালিজম ও ষ্টাইলাইজেশন গঠননির্ভর ও ভঙ্গিপ্রধান চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রথম প্রচেষ্টা আর ভিয়েনের 'দ্যা ক্যাবিনেট অফ ডক্টর কালিগরি' ছবিতে। পরবর্তীকালে চলচ্চিত্র নির্মাণে এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় আইজেনষ্টাইনের ইভান দ্য টেরিবল ছবিতে।

৫. বাস্তববাদী তত্ত্বে বিশ্বাসী চলচ্চিত্র ল্যুমিয়ের ভ্রাতৃদ্বয়ের সময় থেকে আজ পর্যন্ত পরিচালকদের আকর্ষণ করছে। এ ধারার উল্লেখযোগ্য ছবি 'বাই সাইকেল থীভস'এবং 'নানুক অফ দি নর্থ'।

৬. বিজ্ঞান নির্ভর কল্পকাহিনী বা সায়েন্স ফিকশন যা বর্তমান বা ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য জগতের কাহিনী। চলচ্চিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে পরীক্ষা নিরীক্ষা নিরন্তর চলেছে। তার ফলে তৈরী হচ্ছে অজস্র ফ্যাশন আগে যা নিষিদ্ধ বলে মেনে নেয়া হত আজ সেগুলি গ্রহণযোগ্য কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ষ্টাইল, রুচি ও বিচারের মান প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে, বিবর্তিত হচ্ছে। সব মিলিয়ে শতবর্ষ পরে পৃথিবী জোড়া চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রটি আজ নানান বিপরীত স্রোতের টানে খুবই জটিল।

সমস্ত প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে চলচ্চিত্রের বিশ্বব্যাপী আবেদনকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করে যাঁরা সৃষ্টির মধ্যে অমর হয়ে রয়েছেন তাদের মধ্যে চার্লি চ্যাপলিন, বার্গমান, গোদার, ফেলিনি, কুরোসাওয়া, সত্যজিৎ রায় অন্যতম। চ্যাপলিনের গোল্ডরাশ বিশুদ্ধ চলচ্চিত্রের অন্যতম নিদর্শন। নির্বাক চ্যার্লি চ্যাপলিনের আবেদন যে যুগান্তকারী সেটা বোধ হয় তিনি নিজেও জানতেন তাই মডার্ণ টাইমস ছবিতে চ্যাপলিন নির্বাক চলচ্চিত্রের কৌশল ব্যবহার করেছিলেন। যা অনেক সমালোচকের মনে হয়েছিল পশ্চাদপসারণ। চলচ্চিত্রে শব্দ সংযোজনের ফলে স্বাভাবিকভাবেই অভিনয়ের খুঁটিনাটির প্রতি মনোযোগ আর আগের মতো রইল না। অভিনেতার ভাব প্রকাশের জন্য ভাষা সেখানে হাজির। সবাক অভিনয়ের তুলনায় নির্বাক অভিনয় যে অনেকবেশী বাঙ্ময় তার প্রমাণ চ্যাপলিনের গোল্ডরাশ। অবশ্য অভিনেতা পরিচালক চ্যাপলিনের মত প্রতিভাবান ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি শতবর্ষ ব্যাপী চলচ্চিত্র নামক মাধ্যমটিতে খুবই কম লক্ষ্য করা গেছে। ফলে নির্বাক হলেই উৎকৃষ্ট ছবি হবে ও সবাক হলেই তার মান নেমে যাবে এটা কোন তত্ত্ব নয়। শব্দ সংগীত আজকের সিনেমাকে আরো বেশী বাস্তবানুগ হতে সাহায্য করছে। এর আবেদনকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়।

বার্গমান, ফেলিনি, কুরোসাওয়া ও সত্যজিৎ রায়ের ছবির মধ্যে অনেকগুলো উপাদানের সঙ্গে কথাও একটি উপাদান। আসল উপাদান দৃশ্যবস্তু। এবং এই দৃশ্যবস্তুর উপস্থাপনা ভাষার ব্যবধান ঘুচিয়ে দেয় যার জন্য এদের সৃষ্টির মাহাত্ম্যকে ভাষার ব্যবধানে লুকিয়ে রাখা যায় না। এ ক্ষেত্রে বার্গমানের কথানির্ভর ছবি 'সেভেন্থ সীল' বা 'উইনটার প্রাইট' উল্লেখযোগ্য। ফেলিনি বা

বার্গমানের অধিকংশ ছবিই তাদের নিজেদের লেখা। চিত্রনাট্য হিসাবেই লেখা। কুরোসাওয়ার অধিকাংশ ছবি সাহিত্য নির্ভর। আকুতাগাওয়ার গল্প অবলম্বনে তিনি সৃষ্টি করলেন রশোমন। কিন্তু এদের চলচ্চিত্র স্বধর্মে এতই প্রতিষ্ঠিত যে কাহিনীকার কে এ প্রশ্ন অবান্তর হয়ে পড়ে। পরপর তিনবার দেখার পর রশোমন সম্পর্কে সত্যজিৎ রায় বলছেন'The effect of the film on me personally,was electric'। ফরাসী চলচ্চিত্রে নবতরঙ্গ সৃষ্টির অন্যতম ব্যক্তিত্ব জাঁ-লুক -গোদার। অনস্তিত্ত্ববাদ সিনেমার বিষন্ন অনুশোচনা-এই শব্দ ক'টির মধ্য দিয়ে গোদার নবতরঙ্গ সম্বন্ধে তার ধারণা ব্যক্ত করেছেন। পঞ্চাশের দশকে গোদার ও তার বন্ধুরা ত্রুফো, জাকরিভেত, এরিক রোমানর ও জাক দোনিওল, উপলব্ধি করলেন গতানুগতিক পন্থায় আর জীবনের অনুবাদ সম্ভব নয়। প্রচলিত নৈতিকতা মানেই তার কাছে বুর্জোয়া। সুতরাং আঘাত হানবেন। জাঁ লুক সর্বপ্রকার স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে। কেননা স্থিতাবস্থা মানেই ইলিউসন। এই ইলিউসন ভেঙ্গে দিয়ে সিনেমা নামের শিল্পটিকে তিনি শাস্ত্রীয় বন্ধন থেকে অনেকটাই মুক্ত করেছেন। শুধু কম বাজেটে কম সময়ে তারকাবিহীন চলচ্চিত্র সৃষ্টি করেই নয়,নন্দনতাত্ত্বিক সম্প্রসারণের দিক থেকেও। হত্যা, শিহরণ ও পিস্তলময় অত্যন্ত সাধারণ বিষয়কে তিনি শিল্পে উত্তীর্ণ করে দেন। তার সৃষ্টধারা গোদারীয় রীতি নামে পরিচিতি লাভ করে।গোদার নিজেকে নিয়েই আচ্ছন্ন। তাঁর যাবতীয় কথোপকথন নিজের সঙ্গেই। I think of myself as an essayist Producing essays in novel form or novels in essay form, Only instead of Writing, I film them. চলচ্চিত্র ভাষার ব্যাকরণ বদলে দেওয়ার পর খ্যাতির তুঙ্গে থেকেও তিনি সর্বাধিকভাবে আক্রান্ত অথচ সর্বাধিকভাবে আলোচিত। গোদার ঈর্ষা পেয়েছেন, বেশ কিছুটা শ্রদ্ধাও। প্রশংসা খুব কম। তথাপি যতদিন চলচ্চিত্র নামক মাধ্যমটির অস্তিত্ব থাকবে ততদিন পর্যন্ত গোদার বিরক্তিকর হলেও অপরিহার্য।

আজকের এই গতির যুগে একশ বছর পূর্ববর্তী অতীতের হাজার বৎসরের সমান। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে তথ্যাদি আদান প্রদান আজ আর সময় সাপেক্ষ ব্যাপার নয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে চলচ্চিত্রে নিয়ত ক্রিয়াশীল নব্যধারা নব আঙ্গিক ও পরিশীলতার ঢেউ এসে লেগেছে এদেশেও। ১৯১৩ সালে দাদাসাহেব ফালকে নির্মিত রাজা হরিশ্চন্দ্র ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে প্রথম কাহিনীচিত্রের শিরোপা লাভ করেছে। যদিও রেডিও আবিষ্কারের মতো এ ব্যাপারেও বিতর্ক রয়েছে। রবীন্দ্রনাথও সিনেমার প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারেন নি। এদেশে সিনেমার ক্রম বিকাশের ক্ষেত্রে এটা একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা যে তিনি নটীর পূজা চলচ্চিত্রায়িত করেছিলেন। বাংলায় তখন চলচ্চিত্রের বলা যায় শৈশব চলছে। ভারতীয় সিনেমার বিশেষ প্রদর্শনও জনপ্রিয়তা লাভের ক্ষেত্রে মেহবুব খানের আগও রাজকাপুরের আওয়ারা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য দুটো চলচ্চিত্র। প্যারিসের এক হলে আগ লাগাতর পঁচিশ সপ্তাহ প্রদর্শিত হয়ে রেকর্ড স্থাপন করেছে। আওয়ারা ছবির মাধ্যমে রাজকাপুর বিদেশে ভারতীয় দূতের কাজ করেছেন বলা হতো। এত কিছুর পরও এটা চিরন্তন সত্য যে ভারতীয় সিনেমায় নতুন ধারার উন্মেষ ঘটে সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালী ছবিতে। ভারতীয় জীবন ও মানুষের প্রতিনিয়ত বেঁচে থাকার সংগ্রাম সম্পর্কে বর্হিবিশ্বের মানুষের মনে জানার অদম্য আগ্রহকে উস্কে দেয় পথের পাঁচালী। তার পরবর্তী সৃষ্টিগুলি এদেশের মানুষ সম্বন্ধে ইউরোপ ও আমেরিকার ভ্রান্ত ধারণাগুলো ভেঙ্গে

দেয় ও তাদের মধ্যে এক ধরনের সহমর্মিতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে বিমল রায় দো বিঘা জমীন নিয়ে প্রত্যাশা তৈরী করেন। বিলম্বে যাত্রা শুরু হলেও প্রতিভাবান পরিচালকদের স্পর্শে চলচ্চিত্র এদেশেও নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে দ্রুত বিকশিত হয়। ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, মণি কাউল, আদুর গোপাল কৃষ্ণণ,শ্যাম বেনেগাল এর মত স্রষ্টারা সৃষ্টি করেছেন ভারতীয় সিনেমার দিক নির্দর্শনকারী শিল্প। এরই পাশাপাশি তৈরী হয়েছে অগুনতি বিনোদনমূলক দারুণ ব্যবসায়িক সফল সিনেমা। এই শিল্প মাধ্যমটির সঙ্গে বাণিজ্য তার জন্মলগ্ন থেকে জড়িত। ফলে যে ধরনের সিনেমাই তৈরী হোক না কেন তার থেকে ব্যবসা করার আকাঙ্খা লগ্নিকার দের রয়েছেই। পাশাপাশি বেশী সংখ্যাক মানুষের কাছে তার তৈরী শিল্প প্রদর্শিত হোক এ আকাঙ্খাও তীব্রভাবে বিদ্যামান চলচ্চিত্র পরিচালকের হৃদয়ে।

যদিও বা হিন্দীর ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় প্রদর্শনের সুবাদে উভয়ের আকাঙ্খাই বাস্তবায়িত হয় কিন্তু আঞ্চলিক চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে চিত্রটা তত উৎসাহব্যঞ্জক নয়। বহু ভাষাভাষি এ দেশের মানব সংস্কৃতির যথার্থ বিকাশের লক্ষ্যে সুস্থ চলচ্চিত্রকে উৎসাহিত করার জন্য সৃষ্টি হয় জাতীয় চলচ্চিত্র উন্নয়ন নিগম। চলচ্চিত্র প্রযোজনা, প্রদর্শন ও তৎসম্পর্কিত বাধা বিপত্তিগুলি দূর করে প্রতিভাবান পরিচালকদের সৃষ্টিকাজে সাহায্য কল্পে তৈরী হয় নীতি নির্দেশিকা। আমলানির্ভর এই নিগম আর পাঁচটা সংস্থার মতই আশানুরূপ কাজ করতে পারেনি বলে সমালোচনা হয়ে থাকে। যে সমস্ত লক্ষ্যকে সামনে রেখে এমন একটা সংস্থা গড়ে উঠেছে তা যদি ভ্রষ্ট হয় তাহলে যাঁরা এরকম একটা সংগঠনের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন তাদের চেয়ে অনেকগুণ বেশী দায়ী সে সমস্ত বুদ্ধিজীবি ও চলচ্চিত্র নির্মাতারা যারা এর পরিচালকমন্ডলীতে বিরাজ করছেন । সে সমস্ত বুদ্ধিজীবিদের আজ একথা ভাববার সময় হয়েছে যে আশি বৎসর অতিক্রান্ত ভারতীয় চলচ্চিত্র এখনও সাবালক হতে পারল না কেন ? আজো একজন পরিচালক তার দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বাধীন নয় কেন ? এ প্রশ্নগুলো আজ অনেক বেশী প্রাসঙ্গিকতা বয়ে আনে এ জন্য যে অগ্রগতির এই যুগে মননে, কৃষ্টিতে, প্রয়োগে এবং সর্বোপরি মানবিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে এদেশের মানুষের কি শুধুই অধোগমন হয় ? তা না হলে সেন্সর বোর্ড থেকে ছাড়পত্র পাওয়ার পরও প্রদর্শন বন্ধ হয়ে যায় কেন ? এ যুগের নবীনতম শিল্প চলচ্চিত্র এরকম নানা প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে প্রতিনিয়ত। চলচ্চিত্র কি শুধু বিনোদনেরই বস্তু ? এ বিতর্কও সমানে চলছে।

এসব কূট তর্কে যখন সবাই ব্যস্ত তখন প্রায় নীরবে ঘরে ঢুকে পড়েছে টেলিভিশন। মাত্র দশ,পনের বৎসরের মধ্যে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে ছোট্ট এই বোকা বাক্সটি। মানুষ ধীরে ধীরে এর প্রতি আকৃষ্ট হতে লাগলো। সিনেমা যখন ঘরে বসে আরও পাঁচটা সাংসারিক কাজের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় তখন কষ্ট করে হলে গিয়ে সিনেমা দেখার তাগিদ কমে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। এর ফলস্বরূপ ছবি তৈরীর সংখ্যা কিছুটা হ্রাস পেলো বটে কিন্তু বিনোদনের লক্ষ্যে চলচ্চিত্রকারেরা নতুন সব পন্থা তৈরী করতে লাগলেন। নব সাজে, নব রূপে নাচ, গান, মারামারি, প্রেমের মাখামাখি দেখিয়ে এবং কিছুটা মধ্য প্রাচ্যের বাজার দখল করে হিন্দী সিনেমা স্থানীয় দর্শক হ্রাসের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি সামাল দিয়েছে। টেলিভিশনের আগ্রাসনের ফলে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ চলচ্চিত্রকাররা একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছেন। টেলিভিশনে প্রদর্শিত ছবি অনেক বেশী দর্শকের কাছে পৌঁছলেও তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার মত সুযোগ দর্শক পান না। কারণ টেলিভিশনে ছবিটি

চলচ্চিত্র হিসাবে প্রদর্শিত হয় না সেখানে এটা একটা অনুষ্ঠান মাত্র যার বিনিময়ে কর্তৃপক্ষ স্পনসরের থেকে অর্থ আদায় করে থাকেন। তাছাড়া ছবিটি ইচ্ছা হলেও দ্বিতীয়বার দেখার সুযোগ থাকে না। সর্বোপরি রয়েছে, বড় পর্দা ও ছোট পর্দার পার্থক্য। এর পরও শতাব্দীর ঝড় -ঝাপটা পেরিয়ে আসা চলচ্চিত্র শিল্প-টেলিভিশন নামক আধুনিক প্রযুক্তির সামনে দাঁড়িয়ে যে ভাবনার জন্ম দেয় তা হলো-চলচ্চিত্র কি আগামী শতকেও নিজের অস্তিত্ব ঠিক ঠিক ধরে রাখতে পারবে?

ত্রিমাত্রিক প্রতিবিম্ব ও হলোগ্রাফ প্রযুক্তি আলো ও ধ্বনির সূক্ষ্ম মিশ্রণে বাহ্য জগৎ ও রুপালি পর্দার জগৎকে একাকার করে দেয়ার কূট কৌশল চলচ্চিত্রের অস্তিত্ব বিপন্ন করে দিচ্ছে একথা এখনই নিশ্চয় করে বলার সময় হয়নি। বরং যখন কোন শিল্প মাধ্যম আধারগত ও অধোগত দিক থেকে আরো বলিষ্ঠ ও প্রাণোচ্ছল প্রযুক্তিযুক্ত শিল্পমাধ্যমের সংশ্রবে ও সংঘাতে আসে তখনই প্রথম মাধ্যমটির অস্তিত্ব যেন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। কিন্তু বাস্তবে সেই মাধ্যম নতুন আধেয় ও আঙ্গিকের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেয় ও সমৃদ্ধতর আকারে নতুন জীবনী শক্তি নিয়ে দর্শক ও শ্রোতাকে আনন্দ দেয়। চলচ্চিত্র মাধ্যম এর কোন ব্যতিক্রম নয়। আজ থেকে শতবর্ষ পরেও সিনেমা নিয়ে চুলচেরা বিচার হবে। মানুষের প্রতিভার বিকাশের জন্য মানব সমাজের কল্যাণে আরো বেশী করে ব্যবহৃত হবে এই মাধ্যম। চলচ্চিত্রের নতুন ব্যাকরণ তৈরীর জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করে যাবেন কোনো আপনভোলা মানুষ। আগামী শতক এ সব দেখবে-আর সে জন্য সিনেমার বেঁচে থাকাটা ভীষণ জরুরী-আমরা যারা সিনেমা ভালোবাসি,আমাদের মনের ইচ্ছা প্রকাশ করি এর আরো একটি শতায়ু কামনা করে-শতায়ু ভব।

চার্লি চ্যাপলিন

এক চিমটে গোঁফ, একটা ছড়ি, টুপি আর বেঢপ দেখতে এক জোড়া জুতোর ছবি চোখের সামনে দেখতে পেলে যে কেউ বলে দিতে পারে এগুলো ব্যবহার করতেন যিনি, তাঁর নাম চার্লি চ্যাপলিন। কেউ শুধু চার্লি সম্বোধনে অভিব্যক্তি ব্যক্ত করেন আবার কারো কাছে শুধুই চ্যাপলিন। যে নামে যে ভাবে ডাকা হোক না কেন, তিনি আবাল বৃদ্ধের পরিচিত। সবার ভালোবাসা লাভে ধন্য। তাঁর মত সফল অভিনেতা চলচ্চিত্র সৃষ্টির সময় থেকে আজ অব্দি দেখা যায়নি। যে পোশাক তাঁর কাজের পরিচয় বহন করে চলেছে আজ এত বছর ধরে, সে পরিচ্ছদ তিনি কিন্তু খুব ভাবনা চিন্তা করে পরিধান করেননি। চলচ্চিত্রে অভিনয়ের আহ্বান পেয়ে তিনি যখন আমেরিকা গেলেন, তখন তাঁর সদ্য যৌবন। নির্বাক যুগের সে সময়ে হলিউডে তখন চলচ্চিত্র তৈরীর কোম্পানীগুলোতে মাইনে করা সব অভিনেতা-অভিনেত্রী আর কলাকুশলীদের রাখা হতো। সে সময়ের বিখ্যাত কৌতুকাভিনেতা ফোর্ড স্টার্লিং ফিস্টোন কোম্পানী ছেড়ে চলে যাবেন। সে জায়গায় তাঁর প্রতিকল্প হিসাবে চুক্তি করা হলো চার্লির সঙ্গে। এক বছরের চুক্তি। প্রথম তিন মাস সপ্তাহে দেড়শো ডলার করে মাইনে। বাকী নয় মাস একশ পঁচাত্তর ডলার। তা চুক্তি হলো কিন্তু কাজ হচ্ছে না। অপেক্ষা যখন প্রায় ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাতে চলেছে তখনই তাকে বলা হলো যা হোক তাড়াতাড়ি একটা মেকআপ করে আসতে। কারণ এ দৃশ্যে নাকি মজা একটু বেশী রাখতে হবে। সেটে ক্যামেরা আর কুশলীরা সব তৈরী। চার্লি সাজ ঘরে গেলেন, ঠিক করলেন একটু উল্টোপাল্টা সাজবেন। সাজ ঘরে গিয়ে গায়ে দিলেন একটা টাইট কোট যার একটা বোতাম মাত্র লাগানো যায়। নীচে ঢোলা প্যান্ট। মাথায় চাপা টুপি। পায়ে ঢোকালেন মস্ত বড় জুতো। হাতে একটা ছড়ি। কিন্তু বয়েস? চরিত্রটা কি যুবক না প্রৌঢ় না থুথুড়ে? এক চিমটি গোঁফ লাগালো নাকের নীচে। এই সাজ নিয়ে তিনি ফিরে এলেন সেটে। তাঁর হাঁটার ভঙ্গি দেখে সেটের সবাই হাসতে লাগলেন। এবার চরিত্রটার রূপ নিয়ে তিনি বললেন, ভদ্র মহোদয় এবং মহোদয়াগণ, ভাববেন না ইনি নিতান্ত খেঁদি পেঁচি মানুষ, চতুর্দিকে এর ব্যাপক বিস্তার। কখনো ইনি ভবঘুরে, কখনো ভাবুক, কখনো নিতান্ত ভদ্রলোক, কখনো কবি কখনো বা আশাবাদী, অত্যন্ত রোমান্টিক এবং ভীষণ ভাবে দুঃসাহসী। তবে মানুষটা বড় একলা। দুনিয়ায় আপনজন বলে কেউ নেই। নিজেকে সে প্রমাণ করে দেখাতে পারে। সে বৈজ্ঞানিক কখনো

বা গায়ক, কখনো ডিউক, কখনো এর মত পোলো খেলোয়াড় আপনারা দুনিয়া ঘুরেও খুঁজে পাবেন না। দু'একটা ছোট খাটো দোষ আছে। আধপোড়া সিগারেট কুড়িয়ে ইনি খেতে ভালোবাসেন, কিংবা বাচ্চাদের হাত থেকে কেড়ে নেওয়া যে কোন খাবার। তবে রাগীও ভীষণ। ভবঘুরের পরিক্রমা সেই শুরু আর তা চললো বিরামহীন ভাবে বহুদিন।

তাঁর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে সত্যজিৎ রায় তাই সঠিকভাবে বলেছেন যে, "পৃথিবীতে যদি চলচ্চিত্র নামক মাধ্যমটির অস্তিত্ব কোনদিন না-ও থাকে তাহলেও চার্লি চ্যাপলিনের উপস্থিতি থেকে যাবে।" ভাষা, জাতি, সংস্কৃতির বাধা ছাড়িয়ে আজ যে ভাবে চার্লির অবাধ প্রবেশ ঘটেছে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে, সে প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে এটা অনস্বীকার্য যে মানুষের হৃদয়ে তাঁর উপস্থিতি আরো বহুদিন থাকবে।

রোজগারের জন্য অভিনয়কে তিনি পেশা হিসেবে নিয়েছিলেন। অভিনয় করে প্রচুর রোজগারও করেছেন। মৃত্যুর সময় তার সম্পত্তির পরিমাণ ছিল সতেরো কোটি ডলার। গোড়ার দিকে অবস্থাটা কিন্তু এরকম ছিল না। বাল্যকাল কেটেছে চরম দারিদ্রের মধ্যে। মা ছিলেন অভিনেত্রী, চটুল অভিনয় করতেন। বাবা ছিলেন মদ্যপ। অভিনয় তিনিও করতেন। সে সব দিনে নেশা করা ছাড়া উপায়ও ছিল না। বিশেষ করে অভিনেতাদের সব থিয়েটারেই মদের দোকান। পর্দা পড়লেই নিয়ম ছিলো অভিনেতারা দোকানে গিয়ে সাধারণ ক্রেতাদের সঙ্গে বসে মদ খাবে। কোনো কোনো থিয়াটারে টিকিটের আয়ের চেয়ে মদের দোকানের আয়ই বেশি হতো। কোনো কোনো অভিনেতাকে যে বেশী মাইনে দেয়া হতো তা সেই শিল্পীর গুণের বিচারে নয়। মাইনে থেকে পাওয়া অর্থের বেশীর ভাগটাই সে মদের দোকানে দিয়ে আসতো শুধু সেই জন্য। চার্লি বাবাকে তাঁর জন্মের পর থেকে মার সঙ্গে থাকতে কোনদিন দেখেন নি। তাঁর মা ও মাসী অল্প বয়সে ঘর থেকে বেরিয়ে মঞ্চে যোগ দেন। আঠারো বছর বয়সের সময় এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোকের সঙ্গে তিনি আফ্রিকা চলে যান। সেখানে চ্যাপলিনের দাদা সিডনির জন্ম। কিছুদিন পর সিডনিকে নিয়ে তিনি ইংল্যান্ডে চলে এলেন। চার্লির বাবার সঙ্গে দ্বিতীয় বিবাহ করে। লণ্ডনের ওয়াল ওয়ার্থের ইস্ট লেনে ১৮৮৯-র ষোলই এপ্রিল রাত আটটায় চার্লির জন্ম হয়। তাঁর সাড়ে তিন বছর পর্যন্ত কোন কিছুর অভাব ছিল না। মায়ের অসুস্থতা এবং বাবার সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছদ-এ ঘটনাগুলো তাদের সামাজিক অবস্থান এক ধাক্কায় নামিয়ে দিয়ে যায় অনেকখানি। সিডনি ও চার্লি দু'ভাইয়ের ছেলেবেলা কেটেছে মায়ের সান্নিধ্যে। শুধু মা। এই তিনজনের সংসার। প্রতি রাতে থিয়েটার থেকে ফিরে টেবিলের ওপর মা তাদের জন্য কিছু না কিছু রেখে দিতেন। হয়ত একটা দামী কেক নয়ত অন্য কোন মিষ্টি। এই মা'র সম্বন্ধে তিনি জানাচ্ছেন-মার বৈশিষ্ট ছিল চটুল চরিত্রে অভিনয়,' প্রগলভ, ভূমিকায় তাকে মানাতও বেশ। বয়েস ত্রিশের কাছাকাছি, রং ফর্সা, বেগুনী-নীলাভ চোখ, আর এক মাথা হালকা বাদামী রঙের চুল। পিঠ ছাপিয়েও অনেকখানি, ইচ্ছে করলে পেতে বসা যায়। চোখ ধাঁধানো সুন্দরী নন, তবু দেখলে মনে হতো যেন মুখখানি বড় পবিত্র। সেই মায়ের সঙ্গে পাঁচ বছর বয়েস থেকে চার্লি মঞ্চে যেতেন। মা গান গাইতেন, অভিনয় করতেন আর চার্লি উইংসের আড়াল থেকে দেখতেন। মার গাওয়া বেশ কিছু গান চার্লি নকল করে গাইতে পারতেন। সে কথাটা থিয়েটার কোম্পানীর ম্যানেজার জানতেন। একদিন মঞ্চে গান গাইতে গাইতে চার্লির মা'র গলা বসে যায়। গলা দিয়ে বিকৃত স্বর বেরুতে থাকে। শ্রোতাদের মধ্যে অধিকাংশ সেনাবাহিনীর লোক ছিল। পয়সা দিয়ে টিকিট কেটে

লিলি হারলির গান শুনতে এসেছে সব। মঞ্চে তখন শিল্পীর প্রাণান্তকর অবস্থা। কিছুতেই গলা ঠিক হল না। হল জুড়ে শুরু হয়ে গেছে বেড়ালের ডাক। সে এক বিশৃঙ্খল পরিবেশ। এই পরিস্থিতিতে ম্যানেজার পাঁচ বছরের চার্লিকে ঠেলে মঞ্চে তুলে দিলেন। প্রথম মঞ্চাভিনয়ে চার্লি গাইলেন মা'র গাওয়া গানগুলোই। অবিকল যেভাবে তাঁর মা গাইতেন সে ভাবে। দর্শক সে দিনের শিশুর উপস্থাপনা উপভোগ করেছিল, কিন্তু চার্লির মা'র গলা আর সারলো না। ফলে তাঁর মা'কে করতে হয়েছে ধাইয়ের কাজ। সেও জুটতো কালে ভদ্রে, তাও খুব বেশী হলে দু'চারদিনের জন্য। আর করতেন সেলাই। এতো করেও দারিদ্র্যের সঙ্গে যুঝতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত এদের আশ্রয় হলো ল্যামবেথ আশ্রমে। সেখানে কাজের বিনিময়ে গরীবদের খাওয়া দেওয়া হয়। সেখান থেকে কয়েক সপ্তাহ পরে সিডনি আর চ্যাপলিনকে পাঠানো হলো হ্যানওয়েল অনাথ বিদ্যানিকেতনে। সেখানে শুরু হলো শিক্ষা। এদিকে প্রচন্ড মানসিক চাপ আর পরিশ্রমে তাঁর মার শক্ত অসুখ হলো। কে চিকিৎসা করে কেই বা শুশ্রূষা করেন। কিছুদিন পর তাঁর স্থান হলো মানসিক হাসপাতালে। সম্পূর্ণ সুস্থ আর তিনি হন নি। মাঝে মাঝে সুস্থ বোধ করলে পরের দিকে চার্লি নিয়ে আসতেন আবার কিছুদিন পর রেখে আসতেন। কতই বা বয়েস চার্লির তখন। সিড্‌নি রোজগারের চেষ্টায় খবরের কাগজ বিক্রি করে। পরে জাহাজে কাজ নিয়ে চলে যায়। একা চার্লি। তাঁর বাবা তখন জ্যাকসনের সঙ্গে কথা বলে তাঁর ''আট খোকার দলে'' ঢুকিয়ে দিলেন। খাওয়া থাকা বাদে আট ক্রাউন। সেই পেশাদারী মঞ্চাভিনয় শুরু। একের পর এক দল পাল্টেছেন, অভিনয়ের ধারা তৈরী করেছেন। থিয়েটারের দলের সঙ্গে ঘুরেছেন পুরো ইংলন্ড, ফ্রান্স এবং আমেরিকা। শেষের দিকে তাঁর অভিনয়ের জোরেই নাটক চলতো। পোস্টারে তাঁর নামই ছাপা হতো। এক বৃদ্ধ মাতালের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় দেখেই চলচ্চিত্রে অভিনয় করার জন্য বিবেচিত হন। নিজেকে নিয়ে কৌতুক করা এবং নিজের প্রতিকূল অবস্থাকে মজাদার করে তোলার ক্ষমতা তিনি তাঁর শৈশবের দুঃখের দিনগুলি থেকে পেয়েছিলেন এবং এই ক্ষমতাই তাঁর সেই নিজস্ব ধারার মূলমন্ত্র। এ জীবনের কথা চ্যাপলিন কোনওদিন ভুলেন নি। তিনি বলেছিলেন, 'আই হ্যাভ নো হিউমিলিয়েশন অ্যান্ড হিউমিলিয়েশন ইজ এ থিং ইউ ক্যান নট ফরগেট।'

এই ভাবে ছেলেবেলা থেকে বড় হয়ে ওঠার মধ্যেই চ্যাপলিন সংগ্রহ করেছেন তাঁর ছবির উপাদান। ব্যর্থতা, অপমান, লাঞ্ছনা চ্যাপলিনের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছিল এক ট্র্যাজেডিবোধ। পরবর্তী সময়ে এই ট্র্যাজেডিই হয়ে উঠেছিল তাঁর ছবির বিষয়। এই বিষয়কে কেন্দ্র করেই জন্ম নিল 'পৃথিবীর অন্যতম বিস্ময়' ট্র্যাম্প বা ভবঘুরে চরিত্রটি। চ্যাপলিনের কৌতুকরস সৃষ্টি হয়েছে অবাঞ্ছিত কোনও পরিস্থিতিকে আয়ত্তে আনার নিষ্ফল চেষ্টার মধ্যে। আর কৌতুক তখনই জমজমাট হতে পারে যখন এই রকম অনাকঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিতে পরে যখন সমাজের বিত্তশালী প্রতাপশালী মানব-মানবীরা। যেহেতু পৃথিবীর প্রতি দশ জনের মধ্যে নয় জনই গরীব সেখানে বিত্তশালী মানুষ বেকায়দায় পড়লে বাকী নয়জনের আনন্দের সীমা থাকে না। মৃণাল সেন এ সম্পর্কে বলেছেন ''বেয়াড়া পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে গিয়েও মানুষের স্বাভাবিক হওয়ার প্রাণান্তকর ও হাস্যকর প্রয়াসের ভিতর দিয়ে তিনি রূপায়িত করলেন তাঁর জীবনদর্শন। ফলে সমাজের অব্যবস্থা,অবিচার ও অসঙ্গতির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের বিক্ষোভ বা বিদ্রোহ সরাসরি তাঁর ছবিতে স্থান পেল না। তার পরিবর্তে তিনি দেখালেন প্রতিকূল আবহাওয়া পীড়িত ও লাঞ্ছিত হয়েও এক খুদে ভবঘুরে জীবনের সমস্ত

ব্যর্থতার জ্বালা কাটিয়ে উঠে সমাজের মেকি মূল্যবোধগুলিকে আশ্রয় করে নিজেকে সমাজের উপর তলায় প্রতিষ্ঠিত করার অর্থাৎ নিজেকে 'জাতে' তোলার দুরন্ত কসরতে মশগুল হয়ে আছে। প্রতি মুহূর্তেই বেকায়দায় পড়তে হচ্ছে লোকটিকে, তবু সেই বেয়াড়া পরিস্থিতিকে আয়ত্তে আনার তার সে কি প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা। যেন কিছুই হয় নি তার। যেন সম্পূর্ণ সুস্থ, স্বাভাবিক, সহজ পরিবেশেই সে বিচরণ করছে। পরিণতি ঘটে ব্যর্থতায়,বিপর্যয়ে,লাঞ্ছনায় সৃষ্টি হয় হাস্যকর পরিস্থিতি, কী অদম্য উৎসাহ এই খুদে মানুষটির। সমস্ত বঞ্চনাকে ঝেড়ে মুখে খানিকটা দার্শনিক বৈরাগ্যের চালে একবার ঘাড় নাচিয়ে,ঠোঁট উল্টিয়ে আবার টুকটুক করে চলে নতুন উদ্যম, নতুন কাহিনীতে, নতুন পরিবেশে। ভবঘুরে চরিত্রের জন্মের গোড়ায় তিনি চরিত্রটি নিয়ে কি ভাবে অভিনয় করার কথা ভেবেছিলেন তাঁর মুখেই শোনা যাক্-তা মজার ছবির আসল ব্যাপারটা হলো মজার একটা ধরন ঠিক করে নেওয়া অর্থাৎ অভিনেতা কোন ধরনে দর্শককে মজা দেবে। একে অনেকে কায়দাও বলে থাকেন। তো ভেবে ভেবে কায়দা একটা আবিষ্কার করে ফেললাম। হোটেলের ব্যাপার তো। এমনভাবে প্রথমে ঢুকলাম, আমার যেন ঢোকার কথা নয়, যেন চোরাগোপ্তা ভিড়ের গায়ে গা মিশিয়ে হঠাৎ ঢুকে পড়েছি। আমাকেও অতিথির মর্যাদা পেতে হবে। আসলে কিন্তু মানুষটা আমি ভবঘুরে। একটু আশ্রয়ের দরকার তাই সবাই ঢুকছে দেখে আমি ঢুকলাম। ঢুকতে গিয়েই কাণ্ড। এক ভদ্রমহিলার পায়ের উপর পা পড়ে গেলো। অমনি প্রচন্ড লজ্জায় এবং সঙ্কোচে টুপিটা তুলে তার কাছে মাফ চাইলাম। ফিরলাম। দু'পা এগিয়েছি কি এগোইনি, অমনি থুথু ফেলার একটা পাত্রের সঙ্গে দড়াম করে ধাক্কা। পড়লাম উল্টে। তড়িঘড়ি উঠে টুপি তুলে অমনি পাত্রটার কাছে মুখ কাচুমাচু করে মাফ চাইলাম। সে এক দারুণ ব্যাপার। ভবঘুরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলো রাতারাতি। এ এক নতুন চিন্তা। নতুন ধারা। এ ধারার কথা এর অগে দর্শককে কেউ বলতে পারে নি। নিজের ছোট্ট শরীরের নানা ভঙ্গির মাধ্যমে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন নানা অভিব্যাক্তি। ভবঘুরে চরিত্র পেলো মানুষের সহমর্মিতা। মানুষ এই চরিত্রের সঙ্গে একাত্মবোধ করলো। সাবলীল শরীরী কসরতের ছড়াছড়ি তাঁর সব ছবিতে। 'ম্যাবেলস স্ট্রেঞ্জ প্রেডিকামেন্ট' কাহিনী শুরু হয়ে যাওয়ার পর হোটেলের দৃশ্যে ধীরে সুস্থে এসে ঢুকলেন। হোটেলে যে তাঁর কোন কাজ আছে তা নয় তবু ভাবভঙ্গিতে একটা ভারিক্কি মেজাজ ফুটিয়ে তুললেন। হোটেলের টেলিফোনের সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন তিনি পকেটে হাত দিয়ে দেখলেন, যে একটিও পয়সা নেই। সেই মুহূর্তেই লক্ষ্য করলেন যে ম্যাবেল নরম্যাণ্ড এসে হোটেলে ঢুকছে, ম্যাবেলের হাতে শিকল। শিকলের অন্য প্রান্তে বাঁধা রয়েছে কুকুর। তাড়াতাড়ি সরে পড়তে গিয়ে শিকলে আটকে পড়লেন চার্লি। কুকুরটা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর ওপর। শুরু হয়ে গেল কুকুর আর চার্লির মারামারি। হোটেলের কেরাণী এসে এই অবস্থাতেই তাকে ব্যতিব্যস্ত করতে লাগলো। এতেও মেজাজ খারাপ হলো না চার্লির। সমস্ত ঝঞ্ঝাট কাটিয়ে পোশাক থেকে আঙ্গুলের টোকায় ধুলো ঝেড়ে বিনীত ভঙ্গিতে টুপিটা তুলে ধরলেন, সামান্য একটু গোঁফ নাচিয়ে দর্শকদের দিকে ছুঁড়ে দিলেন এক টুকরো হাসি। পুরো ব্যাপারটাই ঘটে গেলো কয়েক মিনিটের মধ্যে। নির্বাক চলচ্চিত্রে মনোভাব ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে শরীরী ভাবভঙ্গি যে কতখানি প্রয়োজনীয় তা তাঁর অভিনয়ে প্রতিষ্ঠিত। অ্যাক্রোবেটিকস-এর প্রয়োগ এমন এক উচ্চতায় নিয়ে গেছেন যে, ভাষা সেখানে কোন বাধাই নয়। তাঁর অভিনয় হাসির আড়ালে মনের কোণে ফুটিয়ে তুলে কান্না। আর সে কাজে সার্থক ভাবে কাজে লাগিয়েছেন মুকাভিনয়। চার্লির অভিনয়ের জোরে কিস্টোন কোম্পানীর রমরমা

অবস্থা। সাধারণত ওরা একেকটা ছবির সর্বোচ্চ কুড়িটা প্রিন্ট করতো। কোন কোনটার ত্রিশটা। ত্রিশটা মানে সাংঘাতিক সফলতা। আর চার্লির ছবির পঁয়তাল্লিশটা প্রিন্ট হয়ে গেছে এবং আরো চাহিদার খবর এসে পৌঁছচ্ছে রোজ বিভিন্ন জায়গা থেকে। চাহিদার সুযোগটা চার্লি নিতে চাইলেন। তাঁর অনেক দিনের ইচ্ছা ছবি নিজে তৈরী করবেন। এবার সেনেটের সঙ্গে কথা বললেন। স্বাভাবিকভাবে কিস্টোন কোম্পানী প্রথম দিকে ঝুঁকি নিতে রাজী ছিলেন না। চার্লি তখন তাঁর সে সময়ের সাড়ে দেড় হাজার ডলার জামিন রাখতে চাইলেন।১৯১৪ সালে তিনি করলেন তাঁর প্রথম ছবি 'কট ইন দ্য রেইন'। ছবিটি অসফল হয় নি। এরপর থেকে চললো একের পর এক মজার ছবি তৈরী করা। ছবি তৈরীব সঙ্গে সঙ্গে অভিনয় দৃশ্যসজ্জার কলাকৌশল এবং সর্বোপরি মূকাভিনয়কে চলচ্চিত্রে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। প্রথম মজার ছবিতে মানবিক আবেদন সংযোজনের প্রয়াস নিলেন তিনি তাঁর 'হিজ নিউ জব' ছবিতে। তাঁর ছবিতে ভবঘুরে আর শুধু কৌতুকাভিনেতা রইলেন না। কৌতুকের আড়ালে চলে এলো চিন্তার খোরাক।'দ্য কিড' ছবিটির মধ্যে হাসির মোড়কে রয়েছে অস্বস্তিকর ইঙ্গিত। বেঁচে থাকাব সংগ্রামে ভবঘুরে কাচ সারাইয়ের কাজ করে। বেশী রোজগারের জন্য তার আশ্রিত শিশুটি (কিড) পাথর ছুঁড়ে কাচ ভাঙ্গছে। পরিস্থিতির চাপে শিশু আর শিশু থাকছে না। যদিও বিশ্ব চলচ্চিত্রেব মহান স্রষ্টা সেরগেই আইজেনস্টাইন তাঁর 'চার্লি দ্য কিড' গ্রন্থে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন যে 'দ্য কিড' ছবিব স্রষ্টা স্বয়ং শিশুই থেকে গেছেন প্রাপ্তবয়স্ক হন নি। আইজেনস্টাইনের বক্তব্য ছিল-আমেরিকা ব্যবহারিক মূল্যবোধ তাড়িত সমাজের আবহাওয়াতে নিষ্পিষ্ট হয়ে চ্যাপলিন তাঁব ছবির জগতে পলায়ন করেন শিশুর মত। শিশুরা যেমন বয়স্ক মানুষের কাণ্ডকারখানা দেখে সেই জগতে প্রবেশ না করে এবং সেই জগতের সঙ্গে বোঝাপড়া না করে নিজের তৈরী কল্পলোকে পলায়ন করে চ্যাপলিনও তেমনি তার বিশিষ্ট পোশাক টুপি ও লাঠিটি নিয়ে সেই জগতে পলায়ন করেছেন। চ্যাপলিনের এই মনোভাবকে আইজেনস্টাইন অভিহিত করেছিলেন 'ইনফ্যান্টিলিজম' বলে। পরবর্তীকালে 'গ্রেট ডিকটেটর' তিনি দেখে যান। 'মঁসিয়ে ভার্দু' দেখেছেন কিনা জানা যায়নি। যদিও 'মঁসিয়ে ভার্দু'র মুক্তির এক বছর পর আইজেনস্টাইন ইহলোক ত্যাগ করেন। 'গ্রেট ডিকটেটর' দেখে তিনি পুস্তকের শেষের দিকে তাঁর সম্বন্ধে শিশুর বিষয়ে ধারণা পাল্টে বলছেন, 'চার্লি দ্য গ্রোন আপ।' 'ফ্যোসিজমের গোলাইয়াথের বিরুদ্ধে হলিউড থেকে ক্ষুদ্রতম ডেভিড চার্লস স্পেনসার চ্যাপলিন বয়স্ক হলেন' বলে তিনি লেখা শেষ করেছেন।

আমেরিকা তথা ধনতান্ত্রিক দুনিয়ায় চার্লির ছবি নিয়েও প্রথম দিকে সে রকম চিন্তা দেখা যায় নি। 'শোল্ডার আর্মস'-এর যুদ্ধবিরোধিতাকে আমেরিকা বিপত্তিকর মনে করেনি। 'গোল্ড রাশে' ভোগবাদী সমাজের ধনলিপ্সার চেহারাকেও নয়, অজস্র ছোট ছবিতে মানবের যন্ত্রীকরণেও নয়, এমনকি 'ইমিগ্রান্ট' ছবিতে ভাগ্যান্বেষীদের স্বপ্নের দেশে আসার দৃশ্যের অন্তর্নিহিত বক্তব্যকেও তাদের নিরাপদ মনে হয়। 'মডার্ণ টাইমসে' এসে তাদের যেন মোহ ভঙ্গ হয়। 'গ্রেট ডিকটেটর' এবং 'মঁসিয়ে ভার্দু'র পরে তো তাদের এতদিনের প্রিয় চার্লি হয়ে ওঠেন চক্ষুশূল। তাকে নিয়ে শুরু হলো একের পর এক চক্রান্ত। 'মডার্ণ টাইমস' ছবি মুক্তি পাবার আগেই বেরুতে লাগলো জোর সমালোচনা। ছবির কাহিনী ছেপে বেরিয়ে গেছে। কারো মতে, এ ছবি কমিউনিস্ট আদর্শে অনুপ্রাণিত। আবার কেউ বললো যে কমিউনিস্ট আদর্শে অনুপ্রাণিত নয়, তবে তার বিরুদ্ধে ছবিতে কিছু বলাও

নেই। দুইয়ের ঠিক মাঝখানে এর অবস্থান। অর্থাৎ ত্রিশঙ্কু যেরকম। চার্লি সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে তখনও দ্বিধা।'গ্রেট ডিকটেটর'-এর পর সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা চার্লিকে কমিউনিস্টদের ঘনিষ্ঠ বলে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে যায়। হিটলার বিরোধী ছবি সে সময় ব্রিটেনে দেখানো যাবে কিনা সে নিয়ে সন্দেহ দেখা দিল। চার্লির তখন জেদ চেপে গেছে। হিটলারকে পাঁচজনের চোখে উপহাসাস্পদ করে তুলতেই হবে। ছবির নির্মাণ যখন চলছে তখন নিউইয়র্ক অফিস থেকে এ ছবি বন্ধ করার জন্য লিখে পাঠালো। এত সব বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে ছবি শেষ হলো। ছবি সমালোচকদের পছন্দ হলো না। তারা নানা কটুবাক্যে এর বিরূপ আলোচনা করেছেন। যদিও এতে'গ্রেট ডিকটেটরের' ব্যবসায়িক ক্ষতি হয় নি। এ পর্ব থেকেই চার্লির বিরুদ্ধে লাগাতর কুৎসা রটনার কাজ শুরু হলো। অথচ এ ছবিতে এসে চ্যাপলিন তাঁর ধারা বদলে ফেলেন। হাস্যরসের পরিবর্তে ব্যঙ্গ রস প্রধান হয়ে ওঠে। আর একাজের জন্য চ্যাপলিনকে তাঁর সাহসের জন্য অভিনন্দন জানান পল গুডম্যান আর স্বয়ং সের্গেই আইজেনস্টাইন। তিনি নাপিতের চরিত্রের বিকাশের মধ্যে এবং তার শেষ ফ্যাসিজম বিরোধী মানবিকতা সমৃদ্ধ বক্তৃতার মধ্যে চ্যাপলিনের উত্তরণ দেখতে পান। এ ছবিতে শব্দ, সংলাপ ও চার্লির কণ্ঠস্বরের প্রয়োগ যে নেহাৎ একটা সবাক ছবির জন্যই নয়, এটা যে এক্ষেত্রে আবশ্যিক তাও বলেছেন। সংলাপ সৃষ্টি ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে চ্যাপলিন যে অনন্য, তার স্বাক্ষর তিনি রেখেছেন 'মঁসিয়ে ভার্দু' ছবিতে। চার্লি নিজে মনে করতেন 'মঁসিয়ে ভার্দু' তার সৃষ্ট সমস্ত ছবির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ভার্দু কোন একটি ব্যাঙ্কের সাধারণ কেরাণি। মন্দার সময় চাকুরী গেছে। এমতাবস্থায় নতুন এক পরিকল্পনা মাথা খাটিয়ে সে বের করেছে। বাছাই বাছাই প্রৌঢ় মহিলাদের সে বিয়ে করে তাকে হত্যা করে। তারপর তার সম্পত্তির মালিক হয়। ব্যক্তি জীবনে সংসারী মানুষ। একমাত্র সন্তানকে নিয়ে স্ত্রী থাকে গাঁয়ের বাড়ীতে। সে অসুস্থ। জানে না স্বামীর পরিকল্পনার ইতিবৃত্ত। ভার্দুও যথেষ্ট কর্তব্যপরায়ণ। একা একটা খুন করার পর বাড়িতে আসে। যেন সারাদিন খাটাখাটুনির পর ভারী ক্লান্ত ভারী পরিশ্রান্ত। দোষ আর গুণের এক আশ্চর্য সমন্বয়। বাড়িতে যখন বাগান পরিচর্যা করে তখন সাবধানে ফেলে পা, একটা পোকা দেখলে তাকে সযত্নে সরিয়ে তবে পা বাড়ায়। অথচ বাগানেরই এক প্রান্তে মস্ত এক কফিনে শোয়ানো থাকে একের পর এক লাশ-তার নিপুণ চিন্তার এক একটি শিকার। ভার্দুর যখন বিচার হয় তখন সে বলে 'আমি না হয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য গোটাকয়েক মহিলাকে খুন করেছি, কিন্তু পৃথিবীতে অত্যন্ত বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে অগণিত নিরীহ নারী ও শিশুকে কি হত্যা করা হয় নি? গণহত্যাকারী হিসাবে তুলনায় আমি একজন অ্যামেচার মাত্র।' তাঁকে যখন বলা হয় দেখলে তো 'ক্রাইম ডাজ নট পে' ভার্দু ছোট করে যোগ করে দেয়। 'নট ইন এ স্মল ওয়ে'। যুদ্ধবাজ দুনিয়া সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য, ওয়ান মার্ডার মেক্স এ ভিলেন, মিলিয়নস এ হিরো, নাম্বার সেকটিফাই। ধনতন্ত্রের শক্তির মূলমন্ত্রই হচ্ছে সংখ্যা। যুদ্ধে নিহত শত্রু সৈন্যের সংখ্যা, ভোটের সংখ্যা, টাকার সংখ্যা, এই সংখ্যাভিত্তিক আধুনিক সমাজকে ভার্দুর চোখে সমালোচনা করেন চ্যাপলিন। পাদ্রি এসে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ভার্দু জানতে চায়, 'ফাদার আমার জন্য আমি কি করতে পারি?' ফাদার যখন প্রার্থনার মাধ্যমে তার আত্মাকে শান্তির জগতে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেন, তখন ভার্দু বলে 'আই এম এট পীস উইথ গড, মাইকনফ্লিক্ট ইজ উইথ ম্যান'। সংলাপ এই ছবিকে সাহিত্যের মর্যাদা দিয়েছে। এক সময় এক পতিতা মহিলাকে ভার্দু সহমর্মিতা দেখিয়েছিল। অনেকদিন পর সেই মেয়েটির সঙ্গে

দেখা হলে ভার্দু তার স্ত্রী ও ছেলে হারিয়ে যাওয়ার কথা বলে। যখন সে জানতে পারে যে মেয়েটি বর্তমানে মারণাস্ত্র উৎপাদন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত তখন সে বলে 'বিজিনেস ইজ এ কথলেস বিজিনেস ডিয়ার।' একটি সাক্ষাৎকারে চ্যাপলিন এই ছবিকে ব্যাখ্যা করেছেন Mr Verdour feels that murder is the logical extension of business.He typities the psychologycal disease and depression. এই 'মঁসিয়ে ভার্দু'ব মুক্তির সময় থেকে আমেরিকার সাংবাদিকরা চ্যাপলিন বিবোধী প্রচার তুঙ্গে নিয়ে গেলো। হলিউডে প্রথম প্রাক মুক্তি প্রদর্শনীর পর আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁকে প্রশ্ন করা হয় 'আপনি কি কম্যুনিস্ট?' আরেকজন জানতে চাইলো, 'আমেরিকার নাগরিকত্ব গ্রহণ কবেন নি কেন?' ব্রেখটের সুরকার হান্স আইলারকে তিনি কি করে চেনেন জানতে চাইলো। ছবি নিয়ে একটাও প্রশ্ন নেই। একটা চক্রান্তের ছক করা হলো। তারই ফলে এক সময় তাঁকে আমেরিকা প্রবেশের পারমিট দিয়েও বাতিল করে দেয়। যদিও বেশ কিছুকাল পর এই নিষেধাজ্ঞা উঠে যায়। কিন্তু চ্যাপলিন আর ফিরে যান নি। এমন কি তাঁর আমেরিকান স্ত্রী উনাও ওদের ব্যবহারে এতই রুষ্ট হয়েছিলেন যে, সে দেশে যেতে রাজী হন নি। চ্যাপলিন বারবার বলেছেন 'আমি কমিউনিস্ট নই। আমি বিশ্ব ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস করি। আমি কামনা করি এক হিংসাহীন পৃথিবী। যেখানে মানবিকতাই হবে একমাত্র বিবেচ্য'। সেই স্বপ্নের পৃথিবীর কল্পনা থেকেই যুদ্ধবিরোধী তীব্র ঘৃণা তাঁর অস্তিত্ব জুড়ে ছিল। ফ্যাসিবিবোধী লেখক শিল্পী গোষ্ঠীভুক্ত না হয়েও যুদ্ধবিরোধী মত প্রকাশ কবেছেন নিঃসঙ্কোচে।

সারা জীবন চার্লি সান্নিধ্য পেয়েছেন সে সময়ের সব বিদগ্ধ জনের। চলচ্চিত্র জগতে একমাত্র ডগলাস ছাড়া তাঁর কোনও বন্ধু ছিল না। তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। আইনস্টাইন ব্রেখট, পিকাসো ও চার্চিল-এব মত ব্যক্তিত্বের সঙ্গে। মহাত্মাগান্ধী যখন গোলটেবিল মিটিংয়ে যান তখন চ্যাপলিন তাঁর দর্শনার্থী হয়েছিলেন। আবার জওহরলাল নেহেরু স্বউদ্যোগে চার্লির সঙ্গে তাঁর সুইজারল্যান্ডের বাড়ীতে দেখা করেছিলেন। সঙ্গে ইন্দিরা ছিলেন।

সম্ভবতঃ মার্কিনী সাংবাদিকদের দ্বারা সৃষ্ট বিরূপ প্রতিক্রিয়ার চাপে 'মঁসিয়ে ভার্দু'র পর চার্লি প্রেমের গল্প নিয়ে ছবি করেন। 'মডার্ণ টাইমস'থেকে'মঁসিয়ে ভার্দু'-পর্যন্ত পরিশীলিত মননের যে ছাপ তিনি রেখেছেন 'লাইম লাইট'-এ তা থেকে তাঁর বিচ্যুতি ঘটেছে বলে অনেকে মনে করেন। ধারা হিসাবে যদিও দুটো দুই ধারা ছবি কিন্তু বক্তব্যের ক্ষেত্রে যে প্রত্যাশা তিনি সৃষ্টি করেছিলেন তার পূরণ এ ছবিতে দেখা যায় না। হয়ত এ কারণেই পিকাসোর 'লাইম লাইট' ভালো লাগে নি। তিনি বলেছিলেন, হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত করার ব্যাপারে চ্যাপলিনের কাজে শাগাল সন্তুষ্ট হতে পারেন, আমি পারি না। আমার কাছে এ ছবি খারাপ সাহিত্য। 'লাইম লাইট'-এ হৃদয়ঘটিত ব্যাপারের প্রাধান্য হলেও চলচ্চিত্র হিসাবে তার মহিমা কিন্তু ক্ষুণ্ণ করেন নি চার্লি চ্যাপলিন।

পরবর্তী ছবি 'এ কিং ইন নিউইয়র্ক'। যুদ্ধ পরবর্তী আমেরিকার চেহারাটা নিজের জীবনে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। যে আমেরিকায় তিনি জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় কাটিয়েছেন, সারা জীবনের কর্মক্ষেত্র, সেই আমেরিকার আচার-আচরণ তাঁকে ব্যথিত করেছিল। এ ছবিতে অনেকে মনে করেন চ্যাপলিন তার সঙ্গে এফ বি আই'র ব্যবহারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে কিছুটা পরিস্ফুট করেছেন। এস্ত্রোভিয়া নামক একটি কাল্পনিক রাজ্যের রাজা শাদভ্ আমেরিকায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় তাঁর রাজ্যে বিদ্রোহের জন্য। সে আমেরিকায় এসে সমসাময়িক ভোগবাদী সমাজের চেহারাটা

প্রত্যক্ষ করেন। তার চোখে দেখা যায় বিজ্ঞাপন, মিডিয়া কি ভাবে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করেছে। এরই মধ্যে বসে সেই রাজ্যচ্যুত রাজা আণবিক শক্তিকে শান্তিপূর্ণ কাজে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেন। এ ছবি ইংলন্ডে মুক্তি পেয়েছিল ১৯৫৭ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর আর গণতন্ত্রী আমেরিকার মানুষ ১৯৭৬ সালের আগে ছবি দেখতে পারে নি। এ ছবিতে রুপার্ট মাকাবি নামে এক বালকের চোখে দেখিয়েছেন আমেরিকান সমাজ কি ভাবে তাকে 'বালক' থাকতে দেয় না। এ ভূমিকায় অভিনয় করেছেন চার্লি পুত্র মাইকেল চ্যাপলিন। রুপার্টের বিবেক এবং আত্মাকে কি ভাবে নিষ্পেষিত করেছে। মাইকেল নিপুণভাবে তা উপস্থাপিত করেছেন বিখ্যাত নাট্যকার ও বন্ধু জে বি প্রিস্টলি 'Social sative and Criticism' এর সঙ্গে হাস্যরস সৃষ্টির আশ্চর্যজনক ক্ষমতার জন্য চ্যাপলিনকে অভিনন্দন জানান। অপর বিখ্যাত নাট্যকার জন ওসবোনও এ ছবিকে 'his most bitter film' বলে অভিনন্দিত করেছিলেন। শেষ ছবি "কাউন্টেস ফ্রম হংকং" এর সময় চার্লি সর্বতোভাবে বৃদ্ধ। এ ছবি তার অন্য সব ছবি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এ ছবিতে তাঁর সে রকম অভিনয় নেই। সামান্য একটি বয়স্ক সী-সিক নেশাগ্রস্ত স্টুয়ার্ডের ভূমিকায় অভিনয় করেন চার্লি। এ ছবিতে অভিনয় করেন মারলোন ব্রাঙ্কো ও সোফিয়াল রেনের মত কলাকুশলীরা। সারা জীবন শুধু যে মজার ছবি তৈরী করে নির্দোষ মজা দেয়ার জন্যই পরিশ্রম করে গেছেন তা নয়, দর্শকদের বিবেক ধরে টানাটানিও করেছেন। একজন পরিণত মানুষ হিসাবে তাঁর উত্তরণের ধাপগুলোও স্পষ্ট। সমাজের পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী যে তাঁর মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতো একথা কোথাও লুকিয়ে রাখারও প্রয়োজন বোধ করেন নি। সাফল্য রাতারাতি এসেছে। কিন্তু সেই সাফল্যকে টিকিয়ে রাখার জন্য প্রতিভার সঙ্গে পরিশ্রমও করতে হয়েছে। অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়ে কখনও একা ভোগ করতে চান নি কিছু। ভাই সিডনির কথা ভেবেছেন সব সময় এক সঙ্গে ব্যবসাও করেছেন। সব কিছু থাকা সত্বেও চেষ্টা করেছেন সাধারণ অনাড়ম্বর জীবন কাটাতে। তৃতীয় স্ত্রী উনা ছাড়া সে অর্থে ভালোবাসা তিনি পান নি কারো কাছে। ভালোবাসার জন্য বন্ধুত্বের জন্য তাঁর মধ্যে এক ধরনের আকুতি দেখা গেছে।

এই চার্লি সম্বন্ধে এক জায়গায় বিখ্যাত সাহিত্যিক সমারসেট মম লিখেছিলেন-"সহজ সুন্দর এবং অনাবিল চার্লির রসিকতা। তবু সব সময়ই মনে হবে যেন এর আড়ালে রয়েছে নিবিড় নিঃসঙ্গতাবোধ। বড় মেজাজী মানুষ। দরকার হয় না আগে থেকে ঘোষণা করে বলতে যে এর পর তিনি কি করবেন বা কি করা উচিত। একটা বিষয়ে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন। যাই করুন না কেন সে রঙ্গ হোক, কি ব্যঙ্গ-আড়ালে থাকবেই তার দুঃখবোধ।

ছবি দেখে কখনও মনে হবে না যে আপনি কোন নিটোল সুখী মানুষের কাহিনী দেখে বেরিয়ে এলেন। আমার মনে হয় বস্তি জীবনের সেই দিনগুলি তাকে এখনও নাড়া দেয়। অভিভূত করে রাখে। যে সম্মান তিনি পেয়েছেন, যে অর্থ যে বৈভব-আমার ধারণা তার নাগপাশে তিনি বন্দী। সে জীবনযাপন করতে তাকে বাধ্য হতে হয়।

মাঝে মাঝেই তার চোখ ফিরে যায় সেই পুরনো দিনে। দেখেন সেই যুবকের ছবি, যে অবিরাম চালিয়ে গেছে তাঁর লড়াই। তাঁর দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে। যদিও সে জানে এর থেকে কোন পরিত্রাণ নেই, কখনো পূর্ণ হবে না তার জীবনের পাত্র। লস এঞ্জেলসে থাকাকালীন একদিন হাঁটতে হাঁটতে তার সঙ্গে গিয়েছিলাম এক বস্তি এলাকায়। শহরের দরিদ্রতম মানুষ সেখানে থাকে। দেখলাম সেই

পরিবেশে পৌঁছে মানুষটার মুখ চোখের ভাব বদলে গেল। বললেন, দেখুন এই হলো সত্যিকারের জীবন। বাকী সব মেকী, মিথ্যে।''এ লেখা পড়ে চার্লির মনে হয়েছে সমারসেট মম তাকে একই সঙ্গে মহান করে তুলেছেন তাঁর ব্যক্তিত্ব আবার অমহানও করেছেন কোন কোন অংশ। শুধু তাই নয়, তাঁর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন-দারিদ্র্যকে অপরের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলাটা চিন্তার বিষয়।

''এমন কোন দরিদ্রের দেখা এখনো আমি পাইনি যে দারিদ্র্য ভালোবাসে। দারিদ্র্যে আমার আকর্ষণ নেই। একে আমি নৈতিক উন্নতি সাধনের পথ বলেও মনে করি না। দারিদ্র্য আমার মূল্যবোধগুলো নষ্ট করে দিয়েছে। আমার অনুরোধ মম যেন এইভাবে মিথ্যের মোড়কে সাজিয়ে তার কোন উপন্যাসের চরিত্র সৃষ্টি না করেন।

আমার রয়েছে বুদ্ধি। বুদ্ধি মানে স্কুল কলেজের পড়া নয়, বুদ্ধি মানে তাবড় তাবড় চিরন্তন সাহিত্য পাঠ নয়, বুদ্ধি জিনিষটা সম্পূর্ণ আলাদা যা হাজার পড়াশুনা করলেও লাভ করা যায় না। মম যাই বলুন না কেন, আমি জানি, আমি মানুষটা যেরকম ছিলাম, তেমনই আছি। আমি এখনও একক। কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ।

আমি সাধারণের চেয়ে আলাদা। পিতৃ পিতামহের ঐতিহ্য আমার শিরায় শিরায় বহমান। আমার স্বপ্ন আছে। আমার আকাঙ্ক্ষা আছে। এবং কিছু বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে। সব যোগ করলে চেহারাটা যেমন দাঁড়ায় আমি ঠিক তাই।''এখানেই চার্লি চ্যাপলিনের বিশেষত্ব। সত্য সে যতই কড়া হোক না কেন তা জোর গলায় বলতে তাঁর কোন দ্বিধা নেই। এই সততাই তাঁর ব্যক্তিত্বকে উজ্জ্বল করেছে। তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে মানুষের অন্তস্থলে। সে কারণেই সাধারণ কৌতুকাভিনেতা হিসেবে শুরু করেও সম্ভব হয়েছে জীবনকে পৌঁছে দিতে বহু মানুষের কাছে। সকলের প্রিয় চার্লি চ্যাপলিন তাই আজও তাঁর ছোট অবয়ব নিয়ে নিজ মহিমায় উজ্জ্বল এক ভবঘুরে।

আইজেনস্টাইন

আধুনিক বিশ্বের নবীনতম প্রযুক্তি নির্ভর শিল্প মাধ্যম চলচ্চিত্র গত একশ বছর ধরে যে সমস্ত প্রতিভাবান স্রষ্টার নিরলস গবেষণা ও প্রয়োগে সমৃদ্ধ হয়েছে- সের্গেই মিখাইলোভিচ্ আইজেনস্টাইন তাঁদের অন্যতম। অনন্য প্রতিভার অধিকারী এই চলচ্চিত্রকার, চলচ্চিত্র তাত্ত্বিক এবং শিল্পকর্মী ১৮৯৮ সালের ২৩ জানুয়ারী রাশিয়ার রিগা শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পিতা জার্মান ইহুদি পরিবারের সন্তান মিখাইল অর্সিপোভিচ্ আইজেনস্টাইন রিগার সড়ক নির্মাণ বিভাগে চাকুরী শুরু করে পরে শহরের প্রধান স্থপতির দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর মা, জুলিয়া ইভানোভনা মধ্যবিত্ত রুশ পরিবারের মেয়ে। জার আমলের পদস্থ আমলার আচার ব্যবহারে আমলাসুলভ উন্নাসিকতার প্রভাব ছিল যা জুলিয়া অপছন্দ করতেন। তিনি ছেলেকে অন্যরকম শিক্ষা দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন এবং তারই প্রভাবে মাত্র দশ বৎসর বয়সে আইজেনস্টাইন সাবলীলভাবে ইংরেজী,ফরাসী ও জার্মান ভাষায় পড়াশুনা করতে পারতেন। আইজেনস্টাইনের যখন বয়স মাত্র এগারো এবং জগৎকে জানার ও বোঝার জন্য মায়ের প্রয়োজন খুব বেশী, এমন এক সময়ে তাঁর বাবা ও মায়ের বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে যায়। এ বিচ্ছেদ আইজেনস্টাইনের জীবনে মর্মান্তিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। বাল্যকাল তাঁর কেটেছে পিতার অধীনে অশিক্ষিত নার্সের তত্ত্বাবধানে। বিষাদময় বাল্যকালের অধিকাংশ সময় তিনি ছবি আঁকার মধ্যে ডুবে থাকতেন। একা, বাগানে বসে খাতার পর খাতা ভরিয়ে তুলতেন নানা ধরনের স্কেচ-এ। এর পাশাপাশি চলতো বই বড়া। ছোটদের বই ছাড়াও পিতা, মাতার বই বা হাতের কাছে যা পেতেন তাই পড়তেন। এভাবেই মাত্র বারো বৎসর বয়সে তিনি পাঠ করলেন ফরাসী বিপ্লবের দুটি খণ্ড। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস তাঁকে ক্রমশঃ রাশিয়ার বিপ্লব সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলে। সমস্ত রাশিয়া জুড়ে তখন বিপ্লবের জোয়ার। বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে সংগঠিত বিপ্লবের চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রতিটি ঘটনা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। এ সময়ের সাহিত্যে গোর্কি ও মায়াকভোস্কির অসামান্য সৃষ্টিও তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। এ সমস্ত ঘটনাগুলো তাঁর জীবনের লক্ষ্য স্থির করে নিতে সাহায্য করলো।

১৯১৭ সাল বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর ইতিহাসে এক সন্ধিকাল। অক্টোবর বিপ্লব রাশিয়ার অগণিত জনগণের জীবনধারায় নিয়ে এলো পরিবর্তনের ছোঁয়া। সিভিল ইঞ্জিনীয়ারের ছাত্র আইজেনস্টাইনের জীবনের মোড়ও ঘুরে গেলো এ সময়ে। তিনি যোগ দিলেন লালফৌজে। নাটক নিয়ে তাঁর পরীক্ষা নিরীক্ষার শুরু এখানেই। তিনি গড়ে তুললেন এক শখের নাটকের দল। নাটক নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা ও পড়াশুনা চালিয়ে নিজেকে ক্রমশঃ একজন সিরিয়াস নাট্যকর্মী হিসাবে গড়ে তুললেন। লালফৌজ থেকে অব্যাহতি পেয়ে তিনি ডিজাইনের দায়িত্ব নিয়ে যোগ দিলেন ফোরেগার্স থিয়েটারে। ঐ সময়ে, সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার শিল্পসংস্কৃতির জগতে ভসেভোলোজ এমিলিয়ে ভিচ মেইয়েবহোল্দ এক পথিকৃৎ নাম। নাটকের গূঢ় তত্ত্ব আরো গভীরভাবে অনুধাবন করার জন্য আইজেনস্টাইনের জীবনে মেইয়ের হোলেদের প্রভাব ও অবদান অপরিসীম। জীবনের শেষ প্রান্তে তিনি স্বীকার করেছেন যে মেয়েইহোল্দের মতো আর কাউকে তিনি ভালোবাসেননি, ভক্তি শ্রদ্ধাও করেননি।

বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় শিল্পী,সাহিত্যিক,বুদ্ধিজীবিরা যেমন সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার প্রয়োজন এবং অপ্রয়োজনের আলোচনায় ঝড় তুলছে তেমনি সদ্যপ্রতিষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে সরকার শিল্প সংস্কৃতিকে কতখানি মতাদর্শগত ভাবে কাজে লাগাতে পারে সে নিয়ে চিন্তাভাবনা চলছিল। এরকম সময়ে আইজেনস্টাইন যোগ দিলেন প্রোলেৎ কুল্ত থিয়েটারে। এই থিয়েটার ও তার কলাকুশলীরা পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর সৃষ্টিকর্মের সঙ্গে জড়িয়েছেন। এখানেই হয় চলচ্চিত্রে হাতে খড়ি। চলচ্চিত্র নিয়ে পরীক্ষার আগে তাঁর নির্দেশনা ও ডিজাইনে মঞ্চস্থ হয়'দ্য মেক্সিকান', 'কিং হাঙ্গার'। এরই পাশাপাশি মস্কোর পলেনভ থিয়েটার প্রযোজিত শেক্সপিয়রের 'ম্যাকবেথ' ও কোরেগারের পরিচালনায় মস্কোর ফ্রি স্টুডিওর নাটকের ডিজাইন করেছিলেন।

এই প্রলেৎকুল্ত থিয়েটারেরই প্রযোজনা আলেকজান্দার অস্ত্রোভস্কির নাটক 'এনাফ সিমপ্লিসিটি ইন্ এভ্রি ওয়াইজ ম্যান'। এ নাটকের পরিচালক ও ডিজাইনার তাঁর বাল্যকালের দেখা সার্কাসের খেলা নিপুণভাবে ব্যবহার করলেন। শুধু যে জীবনের নানা অভিজ্ঞতারই প্রতিফলন ঘটেছে এ নাটকে তা নয়, রাশিয়ায় নাটক ও চলচ্চিত্রের পরীক্ষা নিরীক্ষার ক্ষেত্রে, আইজেনস্টাইন পরিচালিত 'এনাফ সিমপ্লিসিটি' এক দিক নির্দেশ করে। ১৯২৩ সালের মার্চে প্রথম মঞ্চস্থ এই নাটকে তিনি লাভ করলেন, চলচ্চিত্রের প্রথম অভিজ্ঞতা। এই নাটকের মধ্যে প্রায় কুড়ি মিনিটের সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার কর্ণধাররা উপলদ্ধি করতে পেরেছিলেন বলে চলচ্চিত্র ব্যবসার জাতীয়করণ ছাড়াও এর গঠনমূলক ব্যবহারের লক্ষ্যে গঠিত হয়েছে চলচ্চিত্র সম্পর্কে কমিটি। শিক্ষার ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রকে ব্যবহার করার লক্ষ্যে শিক্ষা বিভাগের অধীন একটি চলচ্চিত্র উপবিভাগ গঠিত হলো। অনেকে মনে করেন আইজেনস্টাইনের চলচ্চিত্রে যোগদানের পেছনে লেনিনের প্রভাব বিশেষ চালিকাশক্তির ভূমিকা পালন করেছে।

চলচ্চিত্র সম্পর্কে লেনিন মনে করতেন, অন্যান্য শিল্প মাধ্যমগুলির তুলনায় সিনেমা হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম, আনন্দ পরিবেশনের মাধ্যমে সিনেমা মানুষের মন ও চরিত্রকে গড়ে দিতে পারে, মূল্যবোধ তৈরীতে সাহায্য করতে পারে। লেনিন গুরুত্ব দিয়েছিলেন, চলচ্চিত্রের শিক্ষকের ভূমিকাকে কিন্তু "চলচ্চিত্রকে অবশ্যই শিল্প হতে হবে"। এই শক্তিশালী মাধ্যমকে জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো। পৃথিবীতে এ ধরনের বন্দোবস্ত ইতিপূর্বে কোথাও প্রচলিত ছিল না।

মাত্র কুড়ি মিনিটের চলচ্চিত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞতা তাঁর জানার আগ্রহ বাড়িয়ে দেয়। কুলেশভ তখন স্টেট স্কুল অফ সিনেমার শিক্ষক। সেই কুলেশভ যিনি সরাসরি লেনিনের নির্দেশে কাজ করতেন ও প্রথম লেনিনের ছবি তোলেন। যার অধীনে সোভিয়েত রাশিয়ার বিখ্যাত চলচ্চিত্রকাররা অধ্যয়ন করেছেন এমনকি তাঁর ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন পুদোভকিন। তিনি তখন গ্রিফিটের 'ইনটলারেন্স' ছবির টুকরো, টুকরো অংশ দেখিয়ে তাঁর ছাত্রদের শেখাতেন সম্পাদনা। আইজেনস্টাইন সেই কুলেশভের স্কুলে তিন মাস ধরে প্রতি সন্ধ্যায় যেতেন ও প্রতি সন্ধ্যায় হতো মন্তাজের নানা অনুশীলন। এভাবে তিনি কুলেশভের শিক্ষায় প্রভাবিত হয়ে পরেন যদিও আইজেনস্টাইন মনে করেন যে কুলেশভের মনতাজ ছিলো খণ্ডাংশের 'সংযোগ' আর তাঁর ধারণায় মন্তাজ ছিলো একটি 'সংঘর্ষ'। আবার কুলেশভ মনে করতেন সমস্ত চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে আইজেনস্টাইনই শ্রেষ্ঠ।

কুলেশভের শিক্ষণপদ্ধতির মধ্যে অবশ্যই ছিল মার্কসীয় দর্শন। যে বিপ্লব সমাজনীতি সম্পর্কিত দর্শন আইজেনস্টাইনের সমাজচেতনাকে পরিপুষ্ট করেছে। জীবনের পরিণত বয়সে যখন হলিউডে গিয়েছিলেন তখন ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার চেহারা প্রত্যক্ষ করে মার্কসের 'ক্যাপিটাল' অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মাণের পরিকল্পনা করেছিলেন। রাশিয়ার সর্বত্র যখন চলচ্চিত্রকে আয়ত্ত করার প্রচেষ্টা চলছে, আইজেনস্টাইন তখন তাঁর পরিচালিত শেষ নাটক 'গ্যাস ওয়ার্কার্স' মঞ্চস্থ করলেন, কোনো মঞ্চে নয় একেবারে কারখানায়, শ্রমিকদের মাঝে। এরই মধ্যে তিনজন সমাজসচেতন চিন্তাবিদের চিন্তাধারা তাঁর মনে গভীর দাগ কেটেছে। এরা হলেন, মার্কস, পাভলভ ও ফ্রয়েড। যাদের চিন্তাধারার নির্যাস প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর পরবর্তী সৃষ্টিশীল কাজগুলিতে।

নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে প্রস্তুত করতে ১৯২৪ সালে তৈরী করলেন তাঁর প্রথম চলচ্চিত্র 'স্ট্রাইক'। চলচ্চিত্রটির চিত্রনাট্য তৈরী করেন তিনি নিজে, ভেলরি প্লেৎনিয়ভ এবং প্রলেৎকুল্ত। এই ছবির ক্যামেরার দায়িত্ব নিয়েছিলেন এডোয়ার্ড তিসে। যিনি ইতিপূর্বে কুলেশভের সঙ্গে কাজ করেছিলেন। আইজেনস্টাইন তিসের এই জুটি তাঁর জীবনের শেষ পর্ব পর্যন্ত অটুট ছিল। ওদের দু'জনের মধ্যে দেখা, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার যে ঐক্য ছিল আইজেনস্টাইনের মতে সারা বিশ্বে তার কোনো তুলনা নেই। উভয়ের ঐক্যবদ্ধ চিন্তায় প্রত্যেকটি দৃশ্য গ্রহণ করা হতো সব থেকে সম্ভাব্য প্রকাশভঙ্গীতে। সফল চলচ্চিত্র সৃষ্টির প্রাথমিক শর্ত পরিচালক ও আলোকচিত্রীর মধ্যে সঠিক বোঝাপড়ার প্রয়োজন। আমাদের দেশে এর উজ্জ্বল উদাহরণ সত্যজিৎ রায় ও সুব্রত মিত্র জুটি। 'স্ট্রাইক' ছবিতে সর্বহারা ভবঘুরেদের কিছু চরিত্রে প্রলেৎকুলতের অভিনেতারা অভিনয় করেছিলেন, আর ছিলেন আলোকজান্দ্রাভ, এক ফোরম্যানের ভূমিকায়। তিনি আইজেনস্টাইনের পরবর্তী ছবিতে অভিনয়ের পাশাপাশি চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনায় সাহায্য করেছেন। তিসে আইজেনস্টাইন ও *আলেকজান্দ্রাভের মধ্যে এক মানসিক ঐক্য সৃষ্টি হয়েছিল যা তাদের* সমমনোভাবাপন্ন রাজনৈতিক মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত এদেরকে-'স্ট্রাইক'বলে চিহ্নিত করা হতো। এই স্ট্রাইক ছবিতে দর্শক প্রথম পরিচিত হলেন এক মাসহিরো-র সঙ্গে। এ ধরনের অভিজ্ঞতা দর্শকের ইতিপূর্বে ছিল না। চলচ্চিত্রের পর্দায় একজন বিশেষ ব্যক্তি নয় বিশাল এক জনসাধারণ নায়ক হিসাবে দেখা দিল। আইজেনস্টাইনের চলচ্চিত্রের এক বৈপ্লবিক বৈশিষ্ট্য হলো প্রথাগত ধারণা ভেঙ্গে দিয়ে নতুন ধারা সৃষ্টি করা। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সরকার গঠনের সঙ্গে এর একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনার প্রতিফলন এখানে লক্ষ্য করা যায়। 'স্ট্রাইকে'র চিত্রনাট্য, পরিকল্পনাও

সেভাবেই তৈরী করা, যদিও মূল প্রস্তাব ছিল প্রাকবিপ্লব শ্রমিকশ্রেণীর কার্যকলাপের উপর এক ধারাবাহিক চলচ্চিত্র নির্মাণের যা বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার শিক্ষামূলক কাজে ব্যবহৃত হবে। আইজেনস্টাইনের হাতের ছোঁয়ায় এ ছবি হয়ে গেলো এক অন্যতম পরীক্ষামূলক শিল্পকর্ম। প্যারিসের Exposition Des Arts Decoratifs পুরস্কৃত করলো এই ছবিকে। জার্মানিতে বাণিজ্যিকভাবে দেখানো হলো 'স্ট্রাইক'।

চলচ্চিত্র শিল্পের একশত বৎসরের মধ্যে যে ছবি ইতিহাস সৃষ্টি করেছে তার নাম 'ব্যাটলশিপ পোটেমকিন'। সারা পৃথিবীতে এ যাবৎ সবচেয়ে বেশী আলোচিত, প্রদর্শিত এবং চলচ্চিত্র শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেয়ার কাজে আজও ব্যবহৃত। এই চলচ্চিত্রটি আইজেনস্টাইন ১৯২৫ সালে নির্মাণ করেছিলেন। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ আখ্যায়িত এই ছবি আইজেনস্টাইনকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দিলো। পিয়ের লুইজি লানুগ নামে এক ইতালীয় সমালোচক এই ছবির একটি মাত্র দৃশ্য 'ওদেসা সিঁড়ির দৃশ্য' নিয়ে একটি বই লিখে ফেলেছেন। এছাড়া অগুণতি লেখা বিভিন্ন ভাষায় এ ছবিকে বিশ্লেষণ করে প্রকাশিত হয়েছে, সারা পৃথিবীতে আর কোনো ছবি সম্পর্কে সমালোচকদের এত মুখর হতে দেখা যায়নি। আঙ্গিকের বিচারে চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পকৃতি এ ছবিটির কিন্তু কোন পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না। কথা ছিল ১৯০৫ সালের রক্তাক্ত বিপ্লবের একটি বিস্তৃত চলচ্চিত্র নির্মাণের। আইজেনস্টাইন ও নিনা আগাদঝানেভার যৌথভাবে সে বিষয়ে চিত্রনাট্য লেখা শুরুও করে দেন। বেশ কিছুটা লেখা হওয়ার পর এত বিস্তৃত প্রেক্ষাপট, অজস্র ঘটনা ও অসংখ্য চরিত্রের উপস্থিতি বাস্তবায়িত করার অসুবিধা উপলব্ধি করলেন। এই উপলব্ধি থেকে 'পোটেমকিন' যুদ্ধ জাহাজের অভ্যুত্থানের চলচ্চিত্র তৈরীর প্রচেষ্টায় হাত দিলেন। ১৯০৫ সালের বিপ্লবের অনেকগুলো ঘটনার মধ্যে এটা ছিল মাত্র একটি টুকরো ঘটনা। সেইজন্য সমগ্র লড়াইয়ের সফলতাকে ঐতিহাসিকভাবে প্রতিধ্বনিত করে তুলেছিলেন আইজেনস্টাইন। তাঁর মনে হয়েছিল যদিও ১৯০৫ সালের বিপ্লব রক্তপাতের মধ্যে ডুবে গিয়েছিলো তবুও ইতিহাসের আগামী দিনে অক্টোবর বিপ্লব জয়ী হওয়ার পক্ষে সেটি ছিল এক সফল পদক্ষেপ। এ ছবি সম্পর্কে প্রায় সমসাময়িক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরিচালক পুদভকিন বলেছেন, ''বিজয়ী শ্রমিকশ্রেণীর গড়ে তোলা প্রত্যেকটি মহৎ ও নতুন জিনিসের জীবন্ত অস্তিত্বে এ সময় সমস্ত প্রাক্ বিপ্লবী বুদ্ধিজীবিরা প্রভাবিত ছিলো। যে মানুষের হাতে শিল্পকলার সাথে সর্বহারার কাজের মিলন ঘটেছিল, তাদের ধ্যানধারণার সাথে তখন অতীতের ধারার নির্মম লড়াই চলছিল। সেই নতুন ধারণা তখনও পরিপক্ক হয়নি, আইজেনস্টাইন এমন এক সময়ে ১৯০৫ সালের বিপ্লবী সংগ্রামের বিশালতাকে 'পোটেমকিন' চলচ্চিত্র তুলে ধরেছেন। এক লহমায় সারা বিশ্বের নজর কেড়ে নিলো রাশিয়ার চলচ্চিত্র। পোটেমকিন জয় করলো ইউরোপ, আমেরিকা। আজ বোধ হয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এমন কোনো বই নেই, যেখানে ওদেসা বন্দরের লম্বা বিশাল চওড়া সিঁড়ির আলোচনা নেই। প্রকৃতপক্ষে ওদেসার সিঁড়ি জনগণের কাছে এক তীর্থক্ষেত্রের সম্মান লাভ করেছে। প্রতিনিয়ত মানুষ এই সিঁড়ির কাছে ছুটে এসেছেন বিদ্রোহীদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করতে। ওদেসা বন্দরের এই সিঁড়ি দৃশ্যের বিশ্লেষণ আইজেনস্টাইন করেছেন এভাবে ''বিশেষ এই দৃশ্যে বিভিন্ন চরিত্র তথা জনতার বিহ্বল অবস্থার কথা বাদ দিয়ে আমরা শুধু দেখাব কি ভাবে এখানে গতিকে আবেগের ক্রম আরোহণ প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। শুরুতে ক্লোজ আপে কিছু মানুষের বিশৃঙ্খলা দৌড়াদৌড়ি,

এরপর লং শটে সেই একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি কিন্তু পরের কয়েকটি দৃশ্যে আগেকার বিশৃঙ্খল গতির জায়গায় এল সৈন্যদের পায়ের কিছু শট,বন্দরের সিঁড়ি দিয়ে ছন্দোবদ্ধ পদক্ষেপে তারা নামছে। এখানে লয় বাড়ার সাথে সাথে ছন্দও বাড়তে থাকে। এই অবরোহী গতি তার অন্তিম বিন্দুতে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে আচমকা হল দিক পরিবর্তন সিঁড়ি বেয়ে ছত্রভঙ্গ,পলায়নপর জনতার যে ভীড় আগে দেখেছি তার জায়গা নিল মৃতপুত্র কোলেহৃতভাগ্য নিঃসঙ্গ জননীর মূর্তি। ধীর বিষণ্ণ পদক্ষেপে সিঁড়ি বেয়ে তিনি উঠছেন। ছত্রভঙ্গ জনতার ব্যস্ততায় গতি অবরোহী। তারপর হঠাৎ নিঃসঙ্গ প্রতিমা, ধীর, বিষণ্ণ। এবারে গতি আরোহী। কিন্তু মুহূর্তমাত্র তার স্থায়িত্ব। আবার আকস্মিক দিক্ পরিবর্তন-বিপরীত গতি, অবরোহণ। দ্রুততর ছন্দ নিয়ে আসে বর্ধিত লয়। আবার হঠাৎই ধাবমান জনতার এই দৃশ্যকে অনুসরণ করে আসে সিঁড়ি বেয়ে গড়িয়ে পড়া প্যারাম্বুলেটর-এর দৃশ্য। এবারে কেবল লয় পরিবর্তন নয়, উপস্থাপন পদ্ধতিতেও পরিবর্তন দেখা দেয়-বিমূর্ত থেকে বস্তুগত। অবরোহী গতির এ হলো আরেক দিক''। আইজেনস্টাইন এ ছবিটিকে পাঁচটি অঙ্কে ভাগ করে প্রত্যেকটির আলাদা সাবটাইটেল করে দিলেন। প্রথম অঙ্কের নাম দেয়া হলো 'মানুষ ও মাংসকীট'। এখানে তিনি দেখালেন পচা মাংস খেতে বাধ্য নাবিকদের মধ্যে সৃষ্ট অসন্তোষ। অসন্তোষের কারণটি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি দেখালেন জারের ডাক্তার আতস কাচের সাহায্যে মাংস পরীক্ষা করে ঘোষণা করলেন যে মাংস খাওয়ার উপযুক্ত যদিও খালি চোখেই দেখা যাচ্ছে যে মাংস পোকায় কিলবিল করছে। দ্বিতীয় অঙ্কের নামকরণ করা হয়েছে 'কোয়ার্টার ডেকের নাটক'। এখানে দেখানো হলো নাবিকদের বিরোধিতা। ওরা প্রতিবাদ করলেন ডাক্তারের দেয়া তথ্য এবং ঘোষণা করলেন যে মাংস খাওয়ার অনুপযুক্ত। তৃতীয় অঙ্কের নাম দিলেন 'মৃতের আবেদন' জাহাজ দখলের সংঘর্ষ এবং ওদেসা সিঁড়িতে পরবর্তী সংঘাতের মধ্যবর্তী থমথমে পরিবেশ। বিদ্রোহের নেতা ডাকুলিনচুকের আত্মবিসর্জনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে জাহাজের নাবিকদের সঙ্গে ওদেসার শ্রমিকদের সংহতি। চতুর্থ অঙ্কের শিরোনাম 'ওদেসা স্টেপস' ভ্রাতৃভাবাপন্ন ওদেসার নগরবাসীরা বিদ্রোহী নাবিকদের মধ্যে প্রচুর খাদ্য বিলিয়ে দেয়। জাহাজ এবং তীরের মধ্যে ঐক্য, নাবিক ও নাগরিকদের মধ্যে ঐক্য কর্তৃপক্ষকে শঙ্কিত করে তোলে। তারপর হঠাৎই জারের সৈন্যবাহিনীর ওদেসার সিঁড়ির দিকে অভিযান এবং গুলীবর্ষণে যুবক-বৃদ্ধ নরনারী-শিশু নির্বিশেষে নির্মম হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়। পঞ্চম অঙ্কের শিরোনাম 'মিটিং দ্যা স্কোয়াড্রন' পোটেমকিন আরেকটি যুদ্ধ জাহাজের সম্মুখিন হলো। প্রচন্ড উদ্বেগাকুল মুহূর্ত। বিদ্রোহী নাবিকেরা অপর যুদ্ধ জাহাজের সৈন্যদের সম্বোধন করলেন 'কমরেডস'। পোটেমকিনের দিকে উদ্যত কামানগুলির মুখ নীচু হয়ে গেল। স্কোয়াড্রনের নাবিক ও সৈন্যরা পোটেমকিনের নাবিকদের সঙ্গে সহমর্মিতা প্রকাশ করেন। ''কাহিনীর অভ্যন্তরে বিপ্লবী সৌভ্রাতৃত্বের অনুভূতি এভাবেই পূর্ণতা লাভ করে। আইজেনস্টাইন এ ছবির মাধ্যমে সার্থকভাবে বিভিন্ন বুর্জোয়া দেশে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন শ্রমিকশ্রেণীর চিন্তা, বিপ্লবী ভ্রাতৃত্বের অঙ্গীকার। অথচ বাস্তবে 'পোটেমকিনে'র বিদ্রোহ জারের সৈন্যদের হাতে পর্য্যুদস্ত হয়েছিল। ইতিহাস যথাযথ অনুসরণ না করে,শ্রমিকশ্রেণীর বিজয় চলচ্চিত্রায়নের মাধ্যমে তার সামাজিক দায়বদ্ধতারই প্রকাশ ঘটে ''পোটেমকিন চলচ্চিত্রে।''

এরপর অক্টোবর বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে তৈরী হলো ''অক্টোবর''। বিদেশে অবশ্য এছবিটি 'দুনিয়া

কাঁপানো দশদিন' নামে পরিচিতি লাভ করে। কি ভাবে কেরেনস্কি চলে গেলো, কি ভাবে শীতের প্রাসাদ আক্রান্ত হলো, তার সাথে সাথে লেনিনের জয়লাভ, এই হলো 'অক্টোবরে'র কাহিনীসূত্র। এ ছবিতেও লেনিনগ্রাদের সাধারণ মানুষ অভিনয় করেছেন। 'স্ট্রাইক' ছবিতে যেমন কসাইয়ের ছুরির সাথে অসহায় মানুষের মৃত্যুর বিভীষিকা নিয়ে 'মনতাজ' করা হয়েছে তেমনি 'অক্টোবর' চলচ্চিত্রে দেখানো হয়েছে মেশিনগানের গুলীচালনার দৃশ্য। 'মনতাজ' হচ্ছে আইজেনস্টাইনের প্রিয় বিষয়। এই মনতাজ বিশ্লেষণ করে সারা জীবন তিনি রচনা করেছেন অজস্র নিবন্ধ। তাঁর রচনায় তিনি তাঁরই সৃষ্ট চলচ্চিত্রের দৃশ্যাবলি দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন মনতাজের কলাকৌশল। যদিও 'মনতাজের' স্রষ্টা হিসাবে গ্রিফিথের নাম প্রসিদ্ধ তবুও ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিরন্তর গবেষণা করেছেন রাশিয়ার চলচ্চিত্রকাররা। যাদের মধ্যে অন্যতম আইজেনস্টাইন। তাঁর কাছে চলচ্চিত্র প্রযুক্তির অর্থই হলো মনতাজ। চলচ্চিত্রে মনতাজকে এক কাব্যিকমাত্রা দিয়েছেন তিনি। চলচ্চিত্র নির্মাণের বহু পূর্ব থেকে মনতাজ নিয়ে তাঁর ভাবনা চিন্তা প্রকাশ হতে থাকে বিভিন্ন সাময়িকীতে। পাভলভের প্রাণীবিদ্যাজনিত চিন্তাধারা অ্যাট্রাকসন মনতাজের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত আইজেনস্টাইন এ বিষয়ে প্রথম তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটালেন 'আকর্ষণের মনতাজ' লেখায়। 'দ্য ফিল্মিক ফোর্থ ডাইমেনশন' প্রবন্ধে তিনি ''চলচ্চিত্রে মনতাজের ক্ষেত্রে মাত্রা প্রসঙ্গের অবতারণা করেন। একটি স্থানের যে তিনটি মাত্রা থাকে তার সাথে আধুনিক বিজ্ঞান তাঁর মতে সময়ের চতুর্থ মাত্রা যোগ করে। এটা কোন দৈনিক ব্যাপার নয়। রসিকতা নয়। সঙ্গীতের ওভারটোনের মত দৃশ্যেরও এক ধরনের ওভারটোন থাকে। এই ওভারটোন মনতাজের ক্ষেত্রে এক নতুন সংযোজন। এরপর প্রকাশিত হল 'মেথডস অফ মনতাজ'। এই প্রবন্ধে তিনি প্রশ্ন তোলেন, 'ওভারটোনাল মনতাজ কি চলচ্চিত্র প্রযুক্তিতে কৃত্রিমভাবে আরোপিত? এটাকে মনতাজের সমস্ত পদ্ধতির বিকাশের মধ্যে একটা দ্বান্দ্বিক স্তর হিসাবে কি দেখা যায়? সেই বিশ্লেষণ করতে গিয়েই তিনি একের পর এক মেট্রিক মনতাজ, রিদমিক মনতাজ, টোনাল মনতাজ এবং অবশেষে ওভারটোনাল মনতাজ আর ইনটেলেকচুয়াল মনতাজের প্রসঙ্গ এনেছেন 'মনতাজ' নিয়ে তাঁর নিরন্তর গবেষণা মনতাজকে শুধুমাত্র চলচ্চিত্রের বিষয় হিসাবে আবদ্ধ করে রাখেনি। শিল্পকলার প্রতিটি বিভাগ থেকে উদাহরণ এনে দেখিয়ে দিয়েছেন, মনতাজ হচ্ছে চূড়ান্ত কথা। এমনকি জাপানী নাটক 'কাবুকি'র সঙ্গে 'পোটেমকিন' চলচ্চিত্রের দৃশ্যের তুলনামূলক আলোচনা করে মনতাজ তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছেন।

এছাড়াও জাপানী, চীনা চিত্রকলায় তিনি মনতাজের ব্যবহার আবিষ্কার করেছেন। হলিউডের ব্যবহৃত মনতাজ আইজেনস্টাইনের চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত মনতাজের তুলনায় অনেক পেছনে পড়ে গেল। 'স্ট্রাইক'-এ প্রথম তিনি তাঁর তত্ত্বের প্রয়োগ ঘটান। সেখানে প্রমাণিত হয়ে গেলো যে 'মনতাজ' কত অর্থবহ হতে পারে। আমেরিকা বা ইংল্যান্ডের পর্দায় তখনও মনতাজের এরকম ব্যবহার হয়নি। 'পোটেমকিন' চলচ্চিত্রে এসে আইজেনস্টাইনের মনতাজ মুগ্ধ বিস্ময়ে হতবাক করে দিল চলচ্চিত্রবোদ্ধাদের। ওদেসার সিঁড়ির দৃশ্য কি ভাবে তুলতে হবে বা কি ভাবে মনতাজে আনতে হবে, মূল চিত্রনাট্যে এ বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ছিল না। ওদেসা সিঁড়ি দেখার পর, সিঁড়ির ঐ বিশাল ধাপ, দৃশ্যটি সম্পর্কে ভাবনা সৃষ্টি করে ও কল্পনার নতুন ধাপের প্রেরণা যোগায়। ভয়ার্ত মানুষের ধাক্কাধাক্কি ও শঙ্কিত দৌড়ঝাপ তিনি প্রথম দেখেছিলেন তখনই। মনতাজের বিশ্লেষণ ও

নতুন, নতুন তত্ত্ব সৃষ্টি করতে গিয়ে আইজেনস্টাইন উপলব্ধি করেছিলেন বাল্যকালে গণিত শিক্ষার উপকাবিতা। গণিতের মত নিখুঁত 'মনতাজ' সৃষ্টিই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তাঁর চলচ্চিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে নিখুঁত মাপের মনতাজ। সময় মেপে নেয়া শট ও পরবর্তী সঠিক সম্পাদনা, একেকটা মনতাজে'র স্তরকে অর্থবহ হতে সাহায্য করে। সম্পাদনার ক্ষেত্রেও রাশিয়ান চলচ্চিত্র, হলিউডের ধারা অনুসরণ করেনি। চলচ্চিত্রের আঙ্গিক নিয়ে নিরন্তর গবেষণা ও তাকে ফলপ্রসূভাবে প্রয়োগ করার চিন্তাভাবনা এসেছিল সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে। রাশিয়ার চলচ্চিত্রকে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে উন্নত থেকে উন্নততর পর্যায়ের দিকে এগিযে দেওয়ার জন্য নিয়ত কাজ করেছে-যেখানে হলিউডের চলচ্চিত্রের একমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল বিনোদন। দাযবদ্ধতা যে একটা শিল্পমাধ্যমকে কতখানি গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠতে সাহায্য করে সে কথা আইজেনস্টাইনের পূর্বে এত প্রকট হয়ে দেখা যায়নি। 'ওল্ড এন্ড নিউ' চলচ্চিত্রের সমসাময়িককালে আইজেনস্টাইনেব পরিচয ঘটলো সবাক চলচ্চিত্রের সঙ্গে। সবাক চলচ্চিত্র সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া সুখের ছিল না। পুদভকিন ও আলেকজান্দ্রভেব সঙ্গে যৌথভাবে দেয়া এক বিবৃতিতে তিনি সংশয় প্রকাশ করেছেন।"

"এ ভাবে শব্দকে ব্যবহার মনতাজের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করবে কারণ মনতাজের দৃশ্যের প্রত্যেকটা টুকরোর সাথে শব্দের প্রত্যেকটার মিলন মনতাজের খণ্ডাংশটির গতিময়তা বাড়িয়ে দেবে এবং এর অর্থের স্বাধীনতাও বাড়িয়ে দেবে এবং এটা হবে মনতাজের নিঃসন্দেহে ক্ষতিকারক।" শব্দের ব্যবহার সত্যিই মনতাজের পক্ষে কতটা ক্ষতিকর হবে সেটা সঠিকভাবে বোঝার জন্য ওরা তিনজন বিদেশ পাড়ি দিলেন। প্রথমেই গেলেন হলিউডে সেখানে তাকে দিয়ে ছবি করানোর জন্য প্যারামাউন্ট ও সিন ক্লিয়ারসহ আবো নামিদামি কোম্পানী এগিয়ে এলো। তিনি চিত্রনাট্য তৈরী করলেন কিন্তু শেষ অব্দি ছবি হলো না। এমনকি 'Que viva Mexico' ছবির শুটিং সম্পূর্ণ করেও ছবির সম্পাদনা করতে পারেননি। মূলতঃ প্রযোজকদের অদ্ভুত আচরণে, তিনি সেখান থেকে চলে যান। তবে বিদেশের উল্লেখযোগ্য কাজ হলো মেক্সিকোর জন্য ছবি তুলে দেয়া। প্রকৃতপক্ষে মেক্সিকো চলচ্চিত্রের পথিকৃৎ হয়ে চিহ্নিত হয়ে যান এই ট্রায়ো।

দেশে ফিরে তিনি অনেকগুলি পরিকল্পনা জমা দিয়েছিলেন, এমনকি পল রবসনকে দিয়ে 'ব্ল্যাক ম্যাজেষ্টি'তে অভিনয় করানোর কথাও ভেবেছিলেন। রবসন তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ আলাপচারিতার পর রাজী হয়েছিলেন অভিনয় করতে, কিন্তু রুশ কর্তৃপক্ষ তাঁর সমস্ত পরিকল্পনা বাতিল করে দিলেন এই অজুহাত তুলে যে তিনি ছবির বিউটির দিকে যতটা জোর দেন ইউটিলিটির দিকে ততটা নয়। আইজেনস্টাইন একজন শৃঙ্খলাপরায়ণ মার্কসবাদে বিশ্বাসী সুনাগরিক হিসাবে কোথাও কখনও বিক্ষোভ প্রকাশ করেননি, তিনি শুধু চলচ্চিত্র পরিচালনা থেকে সরে গিয়ে অধ্যাপনায় ডুবে গেলেন। 'আলেকজান্দর নেভস্কি' তৈরী হওয়া পর্যন্ত এই দীর্ঘ দশ বৎসর ধরে তিনি রচনা করেছেন চলচ্চিত্র সম্বন্ধে, চলচ্চিত্র নিয়ে অসংখ্য মূল্যবান প্রবন্ধ সংকলন। আজও তাঁর লেখা পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে অবশ্যপাঠ্য হিসেবে গৃহীত হয় চলচ্চিত্র শিক্ষার বিদ্যালয়সমূহে। তাঁর আগে এমনকি পরেও এতো বিশাল মাপের চলচ্চিত্র তাত্ত্বিকের আবির্ভাব ঘটেনি। চলচ্চিত্রের ভাষা, ভবিষ্যৎ, আঙ্গিক এতসব দিক নিয়ে গবেষণার শুরু করেন তিনি। তাঁর লেখার মাধ্যমে। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় তাঁর বিশ্লেষণ আজও প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি। আইজেনস্টাইন চলচ্চিত্র পরিচালক না হয়ে শুধু একজন চলচ্চিত্র তাত্ত্বিক হয়েও আরও বহুকাল আলোচিত হবেন। এ সমস্ত সৃজনশীল কর্মের

মাধ্যমে আইজেনস্টাইন তাঁর প্রতিভার ছটা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন পৃথিবীর তাবৎ চলচ্চিত্রবোদ্ধার মনে। সবাই একবাক্যে স্বীকার করলো তিনি শুধু আইজেনস্টাইন নন, তিনি চলচ্চিত্রের আইনষ্টাইন। চলচ্চিত্রকে আবিষ্কার, তার সঠিক অর্থে, তিনিই করেছেন। 'আলেকজান্ডার নেভস্কি'র সফলতা রুশ কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করলো আইজেনস্টাইনকে ডেকে ছবি বানানোর বরাত দিতে। 'মসফিল্মে'র আহ্বানে তিনি তৈরী করলেন 'দ্য টেরিবল' চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য। তিন পর্বে সম্পূর্ণ এ ছবির প্রথম দুইপর্বের কাজ তিনি শেষ করতে পেরেছিলেন, তৃতীয় পর্বের আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। 'ইভান দ্য টেরিবল' চলচ্চিত্রের প্রথম পর্ব সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত রাশিয়ার কর্তৃপক্ষ আইজেনস্টাইনকে সে দেশের সর্বোচ্চ পুরস্কারে সম্মানিত করেছিলেন। আবার ঐ একই কর্তৃপক্ষ দ্বিতীয় পর্বের প্রদর্শন বন্ধ করে দিলেন। নিজেদের অনুমোদিত চিত্রনাট্যনির্ভর দ্বিতীয় 'পর্বের ইভান দ্য টেরিবল' দেখে রাশিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি মন্তব্য করেছিলো "চলচ্চিত্র ইভান দ্যা টেরিবল-এর দ্বিতীয় পর্বে দেখা যায় দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ঐতিহাসিক উপকরণের অসাবধানী এবং খামখেয়ালী ব্যবহার, প্রয়োজনীয় উপকরণ সম্পর্কে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে অবহেলাপূর্ণ আচরণ।" এ অভিযোগের যে কোনো ভিত্তি নেই, পরবর্তীকালে তা প্রমাণিত হয়েছে। বস্তুত 'ইভান' চলচ্চিত্রের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তার প্রধান উৎস হলো স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে আইজেনস্টাইনের বক্তব্য। অনেকে মনে করেন ইভানের চরিত্রটি সোভিয়েত রাশিয়ার তৎকালীন শাসক যোসেফ স্তালিনের আদলে তৈরী করা হয়েছিল। প্রথমপর্বে ইভানকে যেমন জনদরদী প্রভু হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল, সোভিয়েত রাশিয়ার যোসেফ স্তালিনকেও তখন সে ভাবে দেখানো হতো। পরবর্তী পর্যায়ে এ ধরনের জনপ্রিয়তা তিনি তাঁর কার্যাবলীর মাধ্যমে ধরে রাখতে পারেননি যার সঙ্গে ষোড়শ শতকের জার ইভানের শাসন পদ্ধতির মিল খুঁজে পান কেউ কেউ। দ্বিতীয় পর্ব নিষিদ্ধ হবার পেছনে ঐতিহাসিক পুনরাবৃত্তির শৈল্পিক বিশ্লেষণই একমাত্র কারণ হিসাবে চিহ্নিত হয়ে পড়েছে। আর একাজটি করার জন্য তাঁকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। এ ছবি তৈরী করে তিনি যে পরিমাণ বিরোধিতার মুখোমুখি হয়েছেন, যত বাধা বিঘ্নের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন ততই তাঁর শরীর ও মনের ক্ষয় দ্রুত হয়েছে। এই চলচ্চিত্রের কিছু অংশে তিনি রঙের ব্যবহার করেছেন। এ সম্পর্কে তাঁর লেখা প্রবন্ধটি তিনি শেষ করতে পারেননি। রঙের তত্ত্ব সম্পর্কে লেখায় ব্যস্ত আইজেনস্টাইন আক্রান্ত হলেন হৃদরোগে। সেই অসম্পূর্ণ স্থানে লাল ক্রেয়নে লিখলেন, এ্যাটাক।

সেই তাঁর শেষ অভিব্যক্তি। ১৯৪৮ সালের দশই ফেব্রুয়ারী রাত ফুরোবার আগেই আইজেনস্টাইনের হৃদপিন্ড স্তব্ধ হয়ে যায়। নীরবে একা অনেকটা অভিমানে এই বিশাল ব্যক্তিত্ব বিদায় নিলেন পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ থেকে। মার্কসবাদে বিশ্বাসী, সমাজতান্ত্রিক আদর্শে লালিত এবং রাশিয়ার চলচ্চিত্রকে বিশ্বের সমকক্ষ করে গড়ে তোলার প্রধান কারিগর আইজেনস্টাইন, কম্যুনিষ্ট পার্টির আচরণে আহত হয়েছিলেন। অন্তর্মুখী সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ এই চলচ্চিত্রকার চেষ্টা করেছিলেন স্তালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সব ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটাতে। আলোচনা করে আপাত সব ঠিক হয়ে গেছে মনে হলেও বাস্তবে যে তা হয়নি সে আজ সবার জানা। বিশিষ্ট চলচ্চিত্র গবেষকরা একথা স্বীকার করেছেন যে 'ইভান দ্য টেরিবল' বিশ্ব চলচ্চিত্র ইতহাসে এক যুগান্তকারী সৃষ্টি। 'ইভান দ্য টেরিবলে'র স্কেচ, চিত্রনাট্য, পরিচালনা, সংগীত নিয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে চলেছে নানারকম বিশ্লেষণ। 'ইভান' চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য অনুদিত হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায়। 'ইভান' সম্পর্কে

প্রচুর লেখালেখি হয়েছে। নানা দৃষ্টিকোণ থেকে আইজেনস্টাইনের কাজের বিশ্লেষণ হয়েছে, হচ্ছে আরো হবে। আমাদের দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচালক সত্যজিৎ রায় এ ছবি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন "সৌভাগ্যক্রমে স্তালিনোত্তর যুগে ইভানের দ্বিতীয় পর্ব দেখে আমরা উপলব্ধি করি যে চলচ্চিত্রে কোনও শিল্পকীর্তি যদি সেক্সপিয়ারের পংক্তিতে স্থান পাবার যোগ্যতা রাখে তবে তা আইজেনস্টাইন রচিত দুই খণ্ডে অসমাপ্ত ইভানের জীবনচিত্র। এ ছবি আদৌ চলচ্চিত্র কিনা, নাকি একে অপরের ছাঁচে ঢেলে পরিচালক চলচ্চিত্রশিল্পের অবমাননা করেছেন বা ইতিহাসকে বিকৃত করার অধিকার চলচ্চিত্র রচয়িতার আছে কিনা ইত্যাদি অনেক অর্বাচীন তর্ক ইভানকে কেন্দ্র করে হয়েছে এবং এখনও হয়ে থাকে। সুখের বিষয় মহৎ শিল্পকীর্তির স্থান চিরকালই সমালোচনার অনেক উর্দ্ধে।" 'ইভান দ্য টেরিবল' যে একটি মহৎ চলচ্চিত্র এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সের্গেই আইজেনস্টাইন শুধু শতবর্ষই নয় আরও বহুদিন আলোচিত হবেন তাঁর সৃষ্টির জন্য, তাঁর তত্ত্বের বিশ্লেষণের জন্য। বস্তুত চলচ্চিত্র নামক মাধ্যমটি যতদিন তার উপস্থিতি বজায় রাখতে পারবে ততদিন পর্যন্ত এই মহান স্রষ্টার অবদান, শিল্পের এই মাধ্যমটিতে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ হবে।

ঋত্বিক ঘটক

ভারতীয় চলচ্চিত্রের গরিমা যাঁদের সৃষ্টিতে নন্দিত হয়েছে,ঋত্বিক ঘটক তাঁদের অন্যতম। ''লোক সংস্কৃতি বাদ দিয়ে কিছু হয় না কি? আমাদের দেশ রামায়ণ-মহাভারতের দেশ। আমাদের দেশের চাষী যে দর্শনের কথা বলে তা মিলবে না বহু দেশেই।'' হ্যাঁ মাটির কাছাকাছি ছিলেন বলে ভারতীয় সংস্কৃতির মূল সুর তার ছবিতে স্বাভাবিকভাবেই প্রতিফলিত হয়েছে। প্রথিতযশা সাহিত্যিকরা বাঙালীর জীবনের মাধুর্য,কারুণ্য,মমতা ও বাৎসল্য দেখেছিলেন,ঋত্বিক দেখেছিলেন জীবনের অভাব, অভিযোগ, ক্লেদ ও ক্ষুদ্রতা। দুটোই সত্য। একটা এত বাস্তব যে মানুষকে প্রতিনিয়ত সে সবের মুখোমুখি হতে হয়। প্রতিনিয়ত লড়াই করে জীবনের প্রতি ভক্তি ও প্রীতি কতটুকু অবশিষ্ট থাকে দেশভাগে বিপর্যস্ত বাঙালী যেমন নিজের অভিজ্ঞতায় তা বোঝে, তেমনি সারা জীবন ঋত্বিকও এ মর্মবেদনা উপলব্ধি করেন। বাঙলার সংস্কৃতি, লোকাচার কথকতা যা দেশভাগের ফলে এপারে এসে কলোনীর বাসিন্দা হওয়া মানুষের মন থেকে হারিয়ে গেছে সেসব ছোট ছোট আচার - অনুষ্ঠান তার ছবিতে গভীর দ্যোতনা নিয়ে হাজির হয় আর সে কারণে-

আমের তলায় ঝামুর ঝুমুর কলাতলায় বিয়া
আইলেন গো সোন্দরীর জামাই মুটুক মাথায় দিয়া
ব্রাহ্মণে চিত্রাইছে পিঁড়ি সোনা রঙ দিয়া।

এই বিয়ের গান উদ্বেল করে তোলে গ্রামের ছবি, যে গ্রামকে ঘিরে কেটেছে ছিন্নমূল মানুষের শৈশব, কৈশোর, যৌবন। সে কথা ভোলা কি অত সহজ? বাঙালীর আকুতির মর্মস্থলটিকে স্পষ্ট করে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন তিনি, ধরে দিয়েছেন তার হৃৎস্পন্দন। সেজন্যই হয়তো সত্যজিৎ রায়ও বলেছেন,''ঋত্বিক আমার চেয়েও বড় বাঙালী ছিলেন। বাঙালী হয়েও তিনি ভারতীয় হয়েছিলেন।''

একথা আজ সবার জানা যে, বাঙলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্রের দিগনির্দেশ করার মত ছবি ১৯৫২ সালে তিনি করেছিলেন। 'নাগরিক' তার জীবদ্দশায় মুক্তি পায়নি। অত্যন্ত আশ্চর্যজনক হলো, দীর্ঘ এই সময়ের মধ্যে এই ছবিটি দর্শকদের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য খুব বেশী প্রচেষ্টাও হয়নি। ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ব্যক্তিগত উদ্যোগে মানুষ দেখতে

পারেন নাগরিক। সে ছবি সময়মত দর্শকের কাছে পৌছলে ঋত্বিক ঘটকের জীবনটা হয়তো অন্যরকম হতে পারত। এ ছবিব তৈরী হওয়া প্রসঙ্গে তাঁব বক্তব্য 'নাগবিক' মোটামুটি একটা কো-অপারেটিভ ভেনচার ছিল। কেউ পয়সা কড়ি নেয়নি, স্টুডিও নেয়নি এমনকি র' ফিল্ম স্টক যেটা পাওয়া যায় না সেটাও আমি বিনা পয়সায় পেয়েছিলাম। এসব ছাড়া যে সামান্য পয়সা লাগে তা আমরা নিজেদের ট্যাক থেকে জড়ো করে করেছিলাম ছবিটা। কিন্তু আমরা এমন বোকা ছিলাম যে, ছবির শেষ পর্যায়ে গিয়ে ব্যবসাগত ব্যাপারে একটা বাজে লোকের খপ্পড়ে পড়লাম আর সমস্ত জিনিসটাই নষ্ট হয়ে গেল, আমাদের মন ভেঙ্গে গেল। বুক ভেঙ্গে গেল। ও ছবি কোনদিনই রিলিজ হবার সম্ভাবনা নেই দেখে আমরা ধরেই নিলাম যে, লোকে ও ছবি আর দেখতে পাবে না। ছবি কমপ্লিট, সেনসোরড এ একটা ট্র্যাজেডি, এ এক ইতিহাস, এর স্তরে স্তরে বহু অধ্যায় আছে। মোটামুটি কথা হচ্ছে বেশ ভালো জুতো খাওয়া দিয়ে শুরু হল আমার কেরিয়ারটা। ভাল মার খাওয়া দিয়ে আরম্ভ, পেটে ভাল পড়েছিল পিঠেও পড়েছিল, বাবা মারা যাবার পর যা কিছু সামান্য খুদকুড়ো পড়েছিল সব চলে গেল এ ছবি করে।''

এ ছবি করার আগে পর্যন্ত তিনি ছিলেন আই.পি.টি.এ-এর সেন্ট্রাল-এর সেক্রেটারি। গণনাট্য সংঘ প্রযোজিত জ্বালা, দলিল, অফিসার, ভাটা বন্দর, সাঁকো প্রভৃতি নাটকের পরিচালক ঋত্বিক ঘটক ছবি করতে এসেছিলেন এ কারণে যে, তাঁর বক্তব্য এই মাধ্যমে বেশী লোকের কাছে পৌঁছতে পারবে। সেই ধারণা থেকেই তার প্রথম ছবিতে যে মানুষদের কথা তিনি বলতে চাইলেন, বাংলাছবিতে এর আগে কারো সেসব মানুষদের কথা মনে হয়নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর বাংলার নিম্ন মধ্যবিত্তের জীবনযন্ত্রণাকে তিনি শিল্পরূপ দিতে চাইলেন। 'নাগরিক' এর কাহিনীর কাঠামোতে তিনি তখনকার বাংলাদেশের নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের ক্ষয়িষ্ণুদের রূপ বর্ণনা করতে চেয়েছেন। তাঁর সিনেমা করতে আসার মধ্যেই ছিল তার রাজনৈতিক চেতনা। যার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে ফার্স্ট ইয়ার ক্লাসে পড়ার সময়। সেই ১৯৪৪ সালে শুরু হলো মার্ক্সিজমের বইপত্র পড়া, লেখা এবং অভিনয় করা। আর এস পি-তে ঝুঁকে গেলেও পরবর্তী সময়ে কমিউনিস্ট পার্টির ঘনিষ্ঠ হলেন। যদিও কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। একটা তিক্ততার মধ্যে ঋত্বিককে সরে যেতে হলো। হেমাঙ্গ বিশ্বাস মনে করেন চলচ্চিত্র জগতের ব্যবসায়িক জগত থেকেই শুধু নয়, পার্টির তরফ থেকেও ঋত্বিক প্রচন্ড অবহেলা পেয়েছিল। যদি তাঁর Ideological base টা basically fundamental Marxism. Marxism not in the sense of this party or that party.Marxism Philosophically,Psychologically,Marx-Engels-Lenin. এত কিছু জানা বোঝার পরও ঋত্বিক নিজেকে কিন্তু হতাশার হাত থেকে রক্ষা করতে পারেননি। গণনাট্যের সময় যে মানুষ মদ স্পর্শ করতেন না, সেই ঋত্বিক পরবর্তী সময়ে চোলাই মদে আকৃষ্ট হলেন আর কিছু লোক তাকে মাতাল প্রতিপন্ন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কেউ আরো এগিয়ে তাঁর ছবির আলোচনার নামে অপ্রকৃতিস্থতার গল্প ছড়ালেন। এই সব ব্যক্তিগত আক্রমণ তাঁকে যত বেশী আহত করেছে তত বেশী করেই যেন তাঁর তরল-গরলে আসক্তি ক্রমশঃ বেড়েছে। এই আত্মহননের পথে তিনি কখনও মার্ক্সীয় বিশ্বাসচ্যুত হননি। মানুষে বিশ্বাস হারানো পাপ-এ বোধ তার লুপ্ত হয়নি শত বোতল সুরাপানেও। তাঁর সব ছবিতেই মানুষের কথা বলা হয়েছে অবশ্য সবার ছবিতেই শুধু নয়, সব ধরনের শিল্পকর্মেই প্রাথমিকভাবে মানুষেরই কথা বলা হয়ে থাকে। তবুও, মানুষের ওপর বিশ্বাস রেখে যেসব তরুণ নিজের জীবন তুচ্ছ করে আদর্শে অবিচল

থেকেছে তাদের কথা এত সোচ্চারভাবে, এত সোজাসুজি সরল ভাষায় ইতিপূর্বে বিশেষ লক্ষ্য করা যায় নি। সেজন্য 'যুক্তি তক্ক-গপ্পো'-তে নীলকণ্ঠ যখন বলেন, ''আমাদের জেনারেশনটা বাস্তবের সঙ্গে নাড়ীর যোগ হারিয়ে ফেলেছে, হয় আমরা চোর নয় বিভ্রান্ত আর *নয়তো কাপুরুষ হয়ে* পালিয়ে যাবার মিছিল। খাঁটি কোন বেটা না। এক শালাও না। তোমরা হচ্ছ ক্রিম অফ বেঙ্গল। আমাদের সম্পূর্ণ পুঁজি। তোমরা আর যাই হও স্বার্থের লোভে প্রাণ দিচ্ছ না। হীরের টুকরো সব। তোমাদের সিনসিয়ারিটি, তোমাদের বীরত্ব, তোমাদের আত্মত্যাগের প্রতিজ্ঞা এসবে আমার কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তোমরা সম্পূর্ণ মিসগাইডেড তোমরা অগ্নিযুগের ছেলেদের মতই সফল এবং নিষ্ফল। তোমরা একদিকে শহীদ আর একদিকে গোঁয়ার এবং অন্ধ'' .... তখন মনে হয় তাঁকে যেন তাঁর সমস্ত উজাড় করে শেষ কথাটি বলে যেতে হবে। অসুস্থ, ক্লান্ত ঋত্বিক শেষ এই কাজে নিজের জীবনকে নিয়ে গড়লেন কাহিনী, প্রধান চরিত্রে অভিনয়ও করেন তিনি। এ প্রসঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন,''যে কথাগুলো বা চিন্তাগুলো আমি প্রকাশ করতে চেয়েছিলাম নায়কের চরিত্র থেকে, আমি কলকাতা শহরের কোনো ছেলের মধ্যে সে জিনিষটা দেখিনি। মানে আমি তো আমি সবাইকেই চিনি...সবাই যারা মানে পার্টটার্ট করে। তাদের কেউই এটা ধরতে পারত না। যেমন মণিদি ছাড়া। মানে তৃপ্তি মিত্র ছাড়া ঐ বউয়ের চরিত্র ওইভাবে পোট্রে আর কেউই করতে পারত না। বহু মেয়ে আছে, কিন্তু এগুলো হচ্ছে ব্যাপার। সিরিয়াস এর মধ্যে দুটোই রোল। এক হচ্ছে আমার, আরেকটা মণিদির। এই দুটোকে ..... যদি পুরনো কমিউনিস্ট না হয় এবং স্ট্রাগলের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে না এসে থাকে, তাদের পক্ষে পসিবল হচ্ছে না।......... এবং আমরা দু'জনেই জানি যে, কি অবস্থায় ঘুরতে ঘুরতে, ঘুরতে ঘুরতে আজকের বাংলাদেশে এসে পৌঁছেছি।''

বাংলাদেশ। নদী, আকাশ, উৎসব পালা-পার্বনে, মুখরিত এক দেশ বাংলাদেশ। হঠাৎ দু-টুকরো হয়ে গেল। অবৈজ্ঞানিক এই ভাগের মধ্যে সামান্যতম মানবতাবোধ নেই। এই জ্বালা, যন্ত্রণা সারা জীবনে ঋত্বিক কাটিয়ে ওঠতে পারেননি। তাঁর প্রথম থেকে শেষ ছবি পর্যন্ত এই ব্যথার কথা ঘুরে ফিরে এসেছে। মিশকালো একটা নিয়তির। এই দেশভাগই যেন বাঙালীকে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে দুর্বিষহ এক সাংস্কৃতিক ছিন্নমূলতার দিকে। যা ক্রমশঃ হারিয়ে দিচ্ছে মাঘ মন্ডল ব্রত, নৌকা বাইচ, এবং জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, বাৎসল্য সম্পর্কীয় নানা লোক ভাবসূত্র, লোকভাষা, লোকসুর ইত্যাদি। এসবেরই ফলশ্রুতি মূল্যবোধহীনতা।''শিল্পী হিসাবে, নিজে যা বোঝেন, অনুভব করেন, তাই দিয়ে মানুষকে আগা পাশতলা মোচড় দেওয়া, তাকে নিজের পারিপার্শ্বিক প্রসঙ্গে ভাবতে বাধ্য করা, ছবি করতে গিয়ে এই ছিল তাঁর প্রতিজ্ঞা।

তারই জোরে সারা জীবন তিনি মানুষের প্রাণস্পন্দনকে ধরতে চেষ্টা করেছেন। গায়ের ঘামে যে জীবনীশক্তি, চোখের জলে যে জীবনশক্তি, গীতা,সীতা, অনসূয়া, বহুবালার যে জীবনীশক্তি, বিমলের মধ্যে যে জীবনীশক্তি, মাতাল নীলকণ্ঠের মধ্যেও ছিল যে জীবনশক্তি, সেই জীবনীশক্তি ছবিতে এসেছে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা থেকে বাংলাদেশের মানুষের প্রতি ভালোবাসা থেকে। ভিয়েৎনাম নামে তিনি একটা ছবি করতে চেয়েছিলেন। কথা ছিল ছবির শেষটা হবে এরকম- একটি গুলীবিদ্ধ তরুণ, ছাত্রও হতে পারে, কৃষকও হতে পারে। তার আর্তনাদ মিশ্রিত উল্লাসের চিৎকার ভেসে আসবে, আর ছেলেটি আছড়ে পড়বে জমির উপরে। মরণের মুখেও দু' হাত দিয়ে জমিটা আঁকড়ে ধরেছে। হাত দুটো পেরিয়ে ক্যামেরায় চলে যাবে ওর চাপ চাপ রক্তের ওপর-ধরণী যা শুষে নিচ্ছে। এই খানে জন্মাচ্ছে আর একটা ভিয়েৎনাম। এই হচ্ছে ঋত্বিক যিনি নিছক

শিল্পের জন্য শিল্পচর্চার জন্য ছবি করেননি। "আমি প্রতি মুহূর্তে আপনাকে ধাক্কা দিয়ে বোঝাবো যদি আপনি সচেতন হয়ে ওঠেন, আমার প্রোটেস্টটাকে যদি আপনার মধ্যে চারিয়ে দিতে পারি, তবে শিল্প হিসাবে আমার সার্থকতা।" আবার এরই বিপরীতে তৈরী করেছেন মাদার আর্কেটাইপের ধারণা। যার সমর্থনে নিজের মত করে ব্যাখ্যাও দিয়েছেন এইভাবে "আমার ছবিতে ইয়ুংয়ের যে ব্যাপারটা প্রচন্ডভাবে আসে সেটা হল ঐ মাদার কমপ্লেক্স। আমাকে আমার এক বন্ধু বলেছিল তোকে মায়ে খেয়েছে। আমার সমস্ত ছবিতে ঐ মা এসে-পড়ে তা মায়ে খেয়েছে কেন? এই যুক্তি গপ্পোর ছবির এনটায়ার ছৌ নাচের raison de'tre হচ্ছে মা-মাদার কমপ্লেক্স, এখানে ঐ মেয়েটা শাঁওলিকে তাঁর সঙ্গে equate করো, জ্ঞানেশ বলছে, নাচো, তোমরা নাচো, তোমরা না নাচলে কিছু হবে না। এটা সম্পূর্ণ ইয়ুং য়িৎয়ান, তিতাসে ছেলেটি স্বপ্ন দেখে মাকে ভগবতীরূপে, এই মাদার কমপ্লেক্স একটা বেসিক পয়েন্ট। বেসিক প্রিমর্ডিয়েল ফোর্স হচ্ছে মাদার কমপ্লেক্স, মা।"এই দুই বৈপরিত্যের টানাপোড়েনের মাঝেই ঋত্বিকের শিল্প। তাঁর বাঙালীত্বের, তাঁর ভারতীয়ত্বের প্রমাণ রয়েছে শুধু তার গল্পে বা চরিত্রায়ণে নয়, তার প্রমাণ রয়েছে তার প্রতীকের ব্যবহারে, তার লোকগীতির ও লোক উৎসবের ব্যবহারে।

ঋত্বিকের দৃষ্টি যে কত গভীরভাবে দেশের মানুষ, মাটিকে আশ্রয় করে থাকত তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 'তিতাস একটি নদীর নাম'। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি' অবলম্বনে তিনি কোন ছবি তৈরীর কথা ভাবেননি এজন্য যে, মানিকবাবু পদ্মানদীর মাঝিদের দেখেছিলেন মধ্যবিত্ত চোখ দিয়ে। তিতাসের জেলেদের জীবনের ছবি যিনি এঁকেছিলেন সেই অদ্বৈত মল্লবর্মণ নিজে ছিলেন একজন মালো। তাঁর দেখা জীবন অনেক নিকট থেকে দেখা ও অনেক আন্তরিকভাবে দেখা। সেই ছবির শেষাংশে ঋত্বিক নতুন জীবনের আশা শুনিয়েছেন, যা মূল রচনায় ছিল না। ঋত্বিক তাঁর শিল্প সৃষ্টিতে ভীষণভাবে আশাবাদী। কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলের মানুষদের কাছে তিতাস শুধুই একটি নদী নয় আরো যে অনেক কিছু এ সত্যটি তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিতাসের বুকে নৌকা নিয়ে বাইচ উৎসবের আদলে রুদ্রসাগরের জল তোলপাড় করে যে নৌকা দৌড় প্রচলিত হয় তা নিয়ে খানিকটা হলেও তৃপ্তি পায় একদা, মালোপাড়ার বাসিন্দারা, যারা ঋত্বিক ঘটকের ছবি দেখে আবার অনুভব করেন জীবন থেকে তিতাস চলে যাওয়ার ব্যথা। হৃদয়ের এই মোচড়ের জন্যই 'তিতাস একটি নদীর নাম' নিছক এক চলচ্চিত্র হয়ে থাকে না। যা শুধু সংশ্লিষ্টদেরই নয় উদ্দীপিত করে ভাবায় আরো অনেককে। যার ফলে কবি লিখে ফেলেন দীর্ঘ কবিতা। "...... আমি ভালোবাসি না নদীর দুই তীরে মানুষের মতো

ঘুরে বেড়ানো ধূর্ত জানোয়ার,
ভালোবাসি না সংঘটিত হত্যাকান্ডের পর রক্তের দাগ-
মানুষের আস্পর্ধা,
ভালোবাসি না হৃদয়হীন বুদ্ধিপ্রধান মনুষ্য সমাজ
যারা একই নদীকে দুই ভাগ করে বানিয়েছে
পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্র"
'আমি নদী ভালোবাসি' অরূপ দত্ত

ঋত্বিকের ছবির বিশেষ এই গুণের কথা মুক্তকণ্ঠে বলেছেন সত্যজিৎ রায় তাঁর 'ঋত্বিক, প্রবন্ধে,"আমরা যারা প্রায় গত চল্লিশ বছর ধরে ছবি দেখছি, তাদের মধ্যে তো প্রায় ত্রিশটা বছর

কেটেছে হলিউডের ছবি দেখে। কেননা কলকাতায় তার বাইরে কিছু দেখার সুযোগ ছিল না সে সময়টায়। উনিশশো ত্রিশ বা পঁচিশ থেকে শুরু করে প্রায় পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বা ষাট অবধি আমরা হলিউডের বাইরে খুব বেশী ছবি দেখতে পারিনি। আমাদের সকলের মধ্যেই তাই কিছু কিছু হলিউডের প্রভাব ঢুকে পড়েছে। কিন্তু ঋত্বিক এক রহস্যময় কারণে সম্পূর্ণ সে প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল। তার মধ্যে হলিউডের কোন ছাপ নেই। এটা যে কি করে হয়েছে সেটা এখনও আমার কাছে রহস্য রয়ে গেছে। যদি প্রভাবের কথা বলতে হয় আমার মনে হয় ঋত্বিকের ছবিতে কিছুটা, কিছু কিছু সোভিয়েত ছবির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সে প্রভাবটা, প্রভাব মানে সেখানে অনুকরণ নয় কারণ ঋত্বিকের প্রধান বৈশিষ্ট্য তার মৌলিকতা এবং সেটা শেষ পর্যন্ত বজায় রেখেছিল। এই সোভিয়েত ছবির প্রভাব এবং সংলাপে, বিষয়বস্তুতে, ছবির পরিসমাপ্তিতে নাটকের প্রভাব তাঁর মধ্যে ছিল এবং এই দুটো জিনিস দাঁড়িয়েছিল যে ভিত্তির ওপর সেটা একেবারে বাংলার মাটিতে বসানো। ঋত্বিক মনেপ্রাণে বাঙালী পরিচালক ছিল,বাঙালী শিল্পী ছিল। আমার থেকেও অনেক বেশী বাঙালী। আমার কাছে সেইটেই তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় এবং সেইটেই তাঁর সবচেয়ে মূল্যবান এবং লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য এই বৈশিষ্ট্যের জোরে ঋত্বিক ঘটক ভাবতেন চলচ্চিত্রের নতুন ভাষা সৃষ্টি হবে ইউরোপে নয় অন্য কোথাও নয় এই মাটিতে, এই দেশে।'' লীলাচলি, লীলাচলি সে যে যুবতী নারী কি দিয়া সাজাইবো তোরে।

এত কিছুর পরেও ঋত্বিক ঘটকের খ্যাতি জুটলো না। আমি এখানে বিদেশী পুরস্কার, প্রশস্তির কথাই বোঝাতে চাইছি, কারণ ছায়াছবির পরিচালকই হোন বা চিত্রশিল্পী অথবা ভাস্কর, সাহেবদের প্রশংসা না পাওয়া পর্যন্ত স্বদেশে তারা তেমন কদর পান না। ঋত্বিক ঘটকের ব্যক্তিগত এমন কোন আকাঙ্ক্ষার কথা শোনা যায়নি তবুও কথাটা সত্যি এ জন্য যে, তাঁর ছবির প্রিন্ট চেয়ে নিয়েও লন্ডন ফেস্টিবল-এ দেখানো সম্ভব হয়নি। অবশ্য, মৃত্যুর পর পরিস্থিতি পাল্টেছে। আজ তাঁর ছবি লোকে দেখছে। তা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। তাঁর মৃত্যুর পর এরকম যে ঘটতে পারে তা তিনি আঁচ করতে পেরেছিলেন। সেকথা বলেও গেছেন। যে সময়ে এ স্বপ্নের কথা শুনিয়েছেন তখন কলকাতায় তাঁর ছন্নছাড়া জীবন। স্ত্রী, কন্যা,পুত্র নিয়ে সাইনিয়ায় আর তিনি ছবির ক্যান মাথায় দিয়ে ঘুমুতেন, যেখানে-সেখানে, পরদিন থেকেই চলত আবার ছবির কাজ। শেষ দুটো ছবি করতে গিয়ে হয়েছে অসম্ভব পরিশ্রম। ছবিগুলো শেষ হলো।

কিন্তু ঘটলো একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি-ছবি রিলিজ হলো না। সে ছবি মুক্তি পেলো তাঁর মৃত্যুর এক বৎসর পর একই সঙ্গে প্রথম ও শেষ ছবি। এই পথ পরিক্রমায় ঋত্বিক ঘটক বোম্বাই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতেও কাজ করেছেন কিছুদিন। লিখেছেন বেশ কিছু ব্যবসায়িক সফল ছবির চিত্রনাট্য। পড়িয়েছেন পুণা ফিল্ম ইনস্টিটিউটে। আজকের সফল পরিচালক সুভাষ ঘাই,অভিনেতা শত্রুঘ্ন সিনহা ও প্রতিভাশালী চলচ্চিত্র পরিচালক সইদ মির্জা, মণি কাউলরা কিছুদিন তাঁকে শিক্ষক হিসাবে পেয়েছিলেন। ওখানে যে ক'দিন ছিলেন মনের স্ফূর্তিতে ছিলেন, ছাত্রদের কাছে যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিলেন এরকমই শোনা যায়। সেখানেও থাকা সম্ভব হলো না, ফিরে এলেন। একটু কমপ্রোমাইজ করতে পারলে-পোষাকীভাবে বলা চলে মানিয়ে নিলে হয়তো এত অস্বচ্ছলতার মধ্যে তাঁকে দিন যাপন করতে হতো না। প্রায় বিনা চিকিৎসায় শেষ হয়ে যেতেন না।'মেঘে ঢাকা তারা'হিন্দী রিমেক করার জন্য শক্তি সামন্ত পেছনে পেছনে ঘুরেছেন খুবই সামান্য কারণে রাজী হলেন না। আমাদের বিচারের কাছে যা সামান্য তাঁর কাছে তাই দাঁড়িয়েছিল অসামান্য, সে কারণে তা-ও হলো না। নিজের অদম্য জেদ, অহেতুক থেকে একটু সরে দাঁড়ালে আয়েস করে জীবন কাটাতে পারতেন। তাহলে অবশ্য ঋত্বিক ঘটক হতেন কি?

চলচ্চিত্র ঃ সংস্কৃতি বিকাশে চলচ্চিত্র উৎসবই শেষ কথা নয়

পৃথিবীজুড়ে অনুষ্ঠিত বাৎসরিক চলচ্চিত্র উৎসবগুলোর তুলনায় যৎসামান্যভাবে আয়োজিত প্রথম আগরতলা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব সৃষ্টির এই মরুসময়ে কিছুটা হলেও আলোড়ন তুলতে পেরেছে। এ যাবৎকাল উৎসবের নামে প্রদর্শিত কিছু উল্লেখযোগ্য ভারতীয় চলচ্চিত্রের বাইরে এই প্রথম সাম্প্রতিককালে তৈরী বিদেশী ছবির ছোট প্যাকেজটি আগরতলার মত একটা প্রান্তিক রাজ্যের রাজধানীতে প্রদর্শিত হলো। এ ধরনের প্রদর্শনী আমাদের বন্ধ দুয়ার খুলে এক লহমায় পৃথিবীর সামনে দাঁড় করায়। শুধুমাত্র কিছু ছবি দেখাই নয়, আগরতলা প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে আগত অভিনেত্রী ক্যারিনো গোমেজ, চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞ কানাডার হানা ফিসার ও মেক্সিকোর পরিবেশক রোজা কেরিলোর সঙ্গে চলচ্চিত্রের নানা দিক নিয়ে মত বিনিময় করা সম্ভব হয়েছে। ছবি নিয়ে নিরন্তর যে চিন্তা ভাবনা চলেছে এদেশে-বিদেশে তার চরিত্র কিন্তু অনেকটাই এক। এটাও বিশ্বায়নের ক্রিয়া কি না জানি না, তবে ওদের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে হলিউডের চাপ আমাদের দেশের বলিউডের মতই যে বেশ শক্তপোক্ত সে কথা আলোচনায় বেরিয়ে এলো। আমেরিকান ছবির 'বোমবার্ডমেন্ট' থেকে নিজেদের কৃষ্টি, সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য স্পেন, কানাডা যেসব পন্থা অবলম্বন করছে এদেশে একইরকম ভাবে জাতীয় চলচ্চিত্র উন্নয়ন নিগম ও বিভিন্ন রাজ্য চলচ্চিত্র উন্নয়ন নিগম সে দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করছে।সে কারণে ওদের দেশেও শিল্পগুণ সমন্বিত ছবির পৃষ্ঠপোষক বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সরকার এবং আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন ট্রাস্টি বোর্ড। এ ধরনের বোর্ডের তত্ত্বাবধানে ভালো ছবি তৈরী ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা পৃথিবী জুড়ে হয়ে থাকে।সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরী এ দেশে সে রকম ছবির সংখ্যা হাতে গোনা যায়-যদিও আন্তর্জাতিক স্তরে সবাই জানে যে, পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী ছবি ভারতেই তৈরী হয়। ছবি তৈরী হয়ে যাওয়ার পরই প্রয়োজন হয় পরিবেশনার। মূল কথা লগ্নি ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা। লগ্নির একটা ব্যবস্থা ক্ষুদ্র হলেও শিল্প গুণান্বিত ছবির ক্ষেত্রে সরকারী স্তরে হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তারপর যে জায়গাটা যে কোন কারণেই হোক সরকার এখনও সফল ভাবে করে উঠতে পারছে না তা হলো

পরিবেশনা, পৃথিবী জুড়ে প্রদর্শনের আয়োজন করা। এই জায়গাটা জুড়ে রয়েছে ব্যবসায়ীরা যাদের নেটওয়ার্ক দুনিয়াজোড়া। এই সব প্রদর্শকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করাটাও চলচ্চিত্র উৎসবে ছবি পাঠানোর অন্যতম এক বৈশিষ্ট। যেখানে শুধুমাত্র দর্শক নয় সে সঙ্গে প্রদর্শকদের উপস্থিতি ভীষণ ভাবে কাম্য। ভারতীয় মানুষের কাছে পৌঁছানোর তাগিদেই এই সব ছবি এ দেশের উৎসবে প্রদর্শিত হয়। পাশাপাশি ভারতীয় ছবি পছন্দসই হলে তা প্রদর্শনের দায়িত্ব নেয়া। এজন্য বিদেশী ডেলিগেটরা 'ইন্ডিয়ান প্যানোরামা' সেকশনের প্রতি বেশী কৌতূহল প্রকাশ করে থাকেন। এ কারণে উৎসবগুলোতে 'মার্কেটিং সেকশন' খোলা হয় সোজা কথায় একটা বাজার , যেখানে সবাই পণ্য নিয়ে হাজির থাকেন, তার গুণমান প্রয়োজনে বিশ্লেষণ করার জন্য। যেহেতু চলচ্চিত্র নির্মাণের সঙ্গে অর্থ লগ্নীর একটা সোজাসুজি সম্পর্ক রয়েছে সে কারণে অর্থ ফিরে পাওয়ার এই প্রচেষ্টা সর্বজনস্বীকৃত। চলচ্চিত্র উৎসবেরও দুটো ধারা রয়েছে,একটা প্রতিযোগিতামূলক, অন্যটি অপ্রতিযোগিতামূলক। আমাদের দেশের উৎসবগুলো দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত। এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে বহু ভারতীয় ছবি পুরস্কৃত এবং পৃথিবী জুড়ে প্রদর্শিত হবার সুযোগও অনেক ক্ষেত্রে পেয়েছে। আগরতলায় অনুষ্ঠিত 'প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব' সে অর্থে উৎসব না হলেও সঠিক দিশা পেলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের কেন্দ্রটি এখানেই হওয়ার সম্ভাবনা তৈরী করতে পেরেছে। যে কেন্দ্রে গড়ে উঠতে পারে বাৎসরিক 'সিনেমা বাজার' যেখানে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ভাষা সংস্কৃতির প্রতিফলনে সৃষ্ট চলচ্চিত্র বিশ্বজয়ের লক্ষ্যে প্রদর্শিত হওয়ার সুযোগ পাবে। বিদেশী ছবির সাথে যারা নিজেদের ছবি 'প্রমোট' করতে আসবেন তাঁরা এখানকার জীবন ও সংস্কৃতির খোঁজ পেয়ে যাবেন এ ধরনের উৎসব থেকে। ওদের তরফে এখানকার উৎসবে যোগদান করার আগ্রহটা তাহলে জোর পাবে। সে লক্ষ্যে পৌঁছতে গেলে নিজস্ব চিন্তাধারা নিয়ে এগোনোর ক্ষেত্র প্রস্তুত করাটা আশু জরুরী। কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব শেষে আগরতলা উৎসবের আয়োজনই সমীচীন সে ক্ষেত্রে। চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্বদের পক্ষে এখানকার উৎসবে যোগ দেয়াটা অনেক সহজ হয়ে যাবে। কলকাতা উৎসব আন্তর্জাতিক স্বীকৃত উৎসব হওয়ায় বৎসরের বিশেষ ঐ সময়ের কথা ছবিনির্মাতা-পরিবেশকদের অজানা নয়। এরই পরে আগরতলা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন যদি বাৎসরিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয় তাহলে এখানকার উৎসবে প্রদর্শিত ছবির সংখ্যাও বেড়ে যাবে। একেবারে প্রথম চলচ্চিত্র উৎসবের ক্ষেত্রে ২০০০ সালে নির্মিত, ভেনেজুয়েলার সাঙগ্রাডোর, স্পেনের এলবোলা ও ফিউজিটিভস, আয়ারল্যান্ড-কানাডার, অন-দি-নোজ, মেক্সিকোর, দি সেকেণ্ড চান্স, জার্মানীর সোকার রুলস ও ভারতীয় রানু ছবির প্রদর্শনী যথেষ্ট উৎসাহব্যঞ্জক। কলকাতা উৎসব যখন প্রথম শুরু হয়েছিল সেরকম সৌভাগ্য তাদেরও হয়নি। পুরানো ছবি দিয়েই শুরু করতে হয়েছিল যে উৎসব আজ সাতটি উৎসবের পর তার চেহারা প্রতিনিধিত্ব স্থানীয় হয়েছে। আর এ বছর তো ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনেল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল বাতিল হয়ে যাওয়ায় কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবই এদেশের একমাত্র চলচ্চিত্র উৎসব। সেই উৎসব কর্তৃপক্ষের সক্রিয় সহযোগিতাই আগরতলা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবকে বাস্তবায়িত করতে পেরেছে। শুরুটা ওরা করে দিয়েছেন,এবার এগিয়ে চলার দায়িত্ব আগরতলা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব কর্তৃপক্ষের। বিশেষ কোন লক্ষ্য না রেখে যদি উৎসব করার জন্য উৎসব নাম দিয়ে কিছু ছবি প্রদর্শন করা মুখ্য হয়ে যায় তাহলে সরকারী অর্থ অপচয় করাই হবে।

সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশ ও পৃষ্ঠপোষকতা ভারতীয় ঐতিহ্য ও পরম্পরা। সেই ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা থেকেই হয়ত এখানে রাজ্য সরকার উৎসবের আয়োজন করেছেন। পাশাপাশি এই অঞ্চলের মানুষের সংস্কৃতি ও ভাষার বিকাশ এবং যথোপযুক্ত উৎসাহ প্রদানও রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এই ধরনের দায়িত্ব পালনের তাগিদ থেকেই আসাম, মণিপুর চলচ্চিত্র উন্নয়ন নিগম তৈরী করেছেন। যারা চলচ্চিত্র সম্পর্কিত পুরো বিষয়টাই দেখাশোনা করেন। শোনা যাচ্ছে, মিজোরাম সরকার এ ধরনের নিগম তৈরীর উদ্যোগ নিয়েছেন এবং নিজস্ব সংস্কৃতি প্রচারের জন্য স্যাটেলাইট চ্যানেল চালানোর চিন্তা-ভাবনা করছেন। মিজোরামে কোন চলচ্চিত্র উৎসব হয়েছে বলে কেউ শোনেনি। এখানকার পরিস্থিতি ও পরিবেশ যথেষ্ট অনুকূল হওয়া সত্ত্বেও চলচ্চিত্র সংক্রান্ত কোন নীতি নির্দেশিকা আজ অব্দি এখানে কেন তৈরী হলো না সেকথা অজানাই রয়ে গেছে। আর এই সুযোগে চলচ্চিত্র তৈরীর নামে দরপত্র আহ্বান করা ও প্রথানুসারে সর্বনিম্ন দরদাতাকে ছবি তৈরীর দায়িত্ব দেয়া হয়। যেখানে বছরে একটা ছবি তৈরী করা প্রায় দুঃসাধ্য কাজ সেখানে এ ধরনের অপচয় হতে দেয়া কেন?

শুধুমাত্র ছবি তৈরী করার জন্য অর্থ জোগান দেয়া নয়, চলচ্চিত্র নির্মাণের লক্ষ্যে পরিকাঠামো গড়ে তোলার প্রচেষ্টা শুরু করার সময় সত্যি বলতে পেরিয়েই গেছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা যে ইতিমধ্যেই স্থান করে নিতে পেরেছে তা সম্ভব হয়েছে প্রধানত বেসরকারী উদ্যোগে। ধারাবাহিকতা না থাকার দরুন শিল্পটি এখনও প্রাতিষ্ঠানিক আকার লাভ করতে পারেনি। সে ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রস্তুতিস্বরূপ চলচ্চিত্র উৎসবের অভিজ্ঞতা যথেষ্ট কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে। ছবি তৈরীর পরিকাঠামো এবং লগ্নীকারকদের উৎসাহিত করার পাশাপাশি চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন শাখা সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল করার বিষয়টি ভাবা যেতে পারে। এ রাজ্যে আজ পর্যন্ত একজন সমালোচক তৈরী হননি যার চোখে ধরা পড়বে শিল্পটির ভালো-মন্দ। শুধুমাত্র চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় সব শাখার ক্ষেত্রেই একজন প্রকৃত সমালোচকের অভাব অনুভব করা যায়। ফিডব্যাকের এই আধুনিক সময়ে 'ফিডব্যাকহীনতা' শিল্পীর মানসিকতায় কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তা সৃজনশীল ক্রিয়ায় যুক্ত ব্যক্তিমাত্রই উপলব্ধি করতে পারেন। ভালো সমালোচক হতে গেলে 'ওয়েজ অব সিয়িং' নিয়ে একটু পড়াশোনা করতে হবে। এ ধরনের সুযোগ করে দিতে পারে বিশ্ববিদ্যালয়। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্‌টি অব ভিস্যুয়াল আর্ট, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফিল্ম স্টাডিসে'র সাহায্যে। এছাড়া ফটোগ্রাফি, শিল্পনির্দেশনা,কস্টিউম ডিজাইন, মেক-আপ ইত্যাদি বিষয়ে স্বল্পকালীন কোর্স চালু করা যেতে পারে। এছাড়াও রয়েছে'সত্যজিৎ রায় ফিল্ম ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট' যাদের সাহায্যে চলচ্চিত্রের ইতিহাস, চলচ্চিত্রের সামাজিক প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে সেমিনার, ওয়ার্কশপের ব্যবস্থা করা সম্ভব। আসলে সমস্ত বিষয়টাই পরস্পরের পরিপূরক। এখানে কোন ইক্যুইপমেন্ট পাওয়া যায় না বলে আমাদের ঐ সব জিনিষপত্র বাইরে থেকে আনতে হয়। সেই সঙ্গে পেশাদার কলাকুশলী। এ কারণে ছবি তৈরীর খরচ এখানে বেড়ে যায়। চলচ্চিত্র শিক্ষার ব্যবস্থা যদি এখানে গড়ে তোলা যায় বা সে লক্ষ্যে ন্যূনতম সুযোগ সৃষ্টি করা যায় তাহলে পেশাদার কলাকুশলী এখান থেকেই বেরুবে, যারা এখানেই কাজ করতে চাইবে। হয়ত এদের থেকেই ভবিষ্যতে একজন বিশ্বমানের শিল্পী বেরুবে। সেই সুযোগটা করে দেয়ার জন্যই পরিকাঠামো গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা।

ভালো দর্শক তৈরী করার লক্ষ্যে আয়োজিত বাৎসরিক চলচ্চিত্র উৎসব নামাঙ্কিত চলচ্চিত্র প্রদর্শনীতে এখানকার তৈরী ছবিগুলো প্রদর্শনের সুযোগ করে দেয়ার কথা কারও মনে পড়ে না। যদিও একথা সবার জানা যে, অনেক কষ্ট করে যারা ছবি তৈরী করেছেন উপযুক্ত পরিবেশনার অভাবে তাদের ছবি সে ভাবে প্রদর্শিত হতে পারেনি। আমাদের অভিনেতাদের অভিনয় ক্ষমতা, সংগীত পরিচালকের সংগীতের ব্যবহার, গল্পকার, চিত্র নাট্যকারের দক্ষতা, ব্যর্থতা কি সেই সব দর্শকরা জানতে পেরেছেন যাদের কথা মাথায় রেখে চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করা হয়? অর্থাৎ ভালো ছবি দেখানো, সুস্থ বোধ সমন্বিত চলচ্চিত্র নির্মাণে উৎসাহ প্রদান, চলচ্চিত্র নির্মাণে সহযোগিতা করার লক্ষ্যে ন্যূনতম কিছু ইক্যুইপমেন্টস-এর ব্যবস্থা করা, পেশাদার কলাকুশলী তৈরী করার লক্ষ্যে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেয়া এবং এখানকার ছবিকে প্রদর্শনের সুযোগ করে দেয়া-এই সমস্তটাই চলচ্চিত্রকে এখানে শিল্প হিসাবে গড়ে ওঠার প্রাথমিক শর্ত। সেই শর্ত পূরণের জন্য সরকারী, বেসরকারী সকল স্তরেই আন্তরিক প্রচেষ্টা জরুরী। বাইরের সব কিছুই ভালো, এই ধরনের মানসিকতা হীনমন্যতারই জন্ম দেয় শুধু। এখানকার মানুষ গোয়া দেখেছেন, উটি গেছেন এবং কোণারকও দেখেছেন তাদের মধ্যে কতজন জম্পুই, ঊনকোটি, পিলাক দেখেছেন? এই মানসিকতা কি সুস্থ সাংস্কৃতিক মননের বিকাশ ঘটাবে?

উদ্যোক্তারা যদি উৎসব-উৎসব অনুষ্ঠান করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেন তাহলে এত কথা বলা অর্থহীন হয়ে যাবে। কিন্তু যখন রাজ্য সরকার এ ধরনের উদ্যোগের সঙ্গে জড়িয়ে যান তখন কল্যাণকামী রাষ্ট্রের কর্তব্যরূপে এটা মনে করা যেতে পারে সামগ্রিক ভাবে যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জন্য আমরা গর্ব অনুভব করি তাকে শুধু এগিয়ে নিয়ে যাওয়া নয়, সুন্দর, সুস্থ ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে চলচ্চিত্র মাধ্যমটিকে ব্যবহার করার কথা ভাববেন। লেনিন মনে করতেন, অন্যান্য শিল্প মাধ্যমগুলির তুলনায় সিনেমা হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম, আনন্দ পরিবেশনের মাধ্যমে সিনেমা মানুষের মন ও চরিত্রকে গড়ে দিতে পারে, মূল্যবোধ তৈরীতে সাহায্য করতে পারে। আগরতলা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব এই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত থেকে সুস্থ সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের কাণ্ডারি হতে পারে কিনা তা নির্ভর করছে সঠিক পরিচালনার উপর।

আধুনিক অসমীয়া চলচ্চিত্রের রূপকার 'ভবেন্দ্রনাথ শইকীয়া'

অসমের সর্বকালের কীর্তিমান কুড়িজন অসমীয়ার অন্যতম ভবেন্দ্রনাথ শইকীয়ার দেহাবসানের মধ্য দিয়ে বর্তমান সময়ের শাল প্রাংশু ব্যক্তিত্বের অভাব উত্তর পূর্বাঞ্চলের সাহিত্য সংস্কৃতি গগনে অনুভূত হবে। হাতে গোণা যে কয়েকজন চিত্র পরিচালকের সৃষ্টির জন্য সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া এই উত্তর পূর্বাঞ্চলের মানুষের ভাষা সংস্কৃতির সঙ্গে সম্যক পরিচয় বহির্বিশ্বের ঘটেছে-সদ্য প্রয়াত ভবেন্দ্রনাথ শইকীয়া তাঁদের মধ্যে অন্যতম। অসমীয়া চলচ্চিত্রের প্রাণ পুরুষ ভবেন বাবুর চলচ্চিত্রের সাহায্যে অসমীয়া চলচ্চিত্রে নব্য ধারার প্রবর্তন সম্ভব হয়েছিল। অনন্য প্রতিভার অধিকারী ভবেনবাবু তাঁর জীবন শুরু করেছিলেন কটন কলেজের শিক্ষকরূপে। অল্প কিছুদিনের মধ্যে তিনি গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে যোগ দেন। গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জনপ্রিয় অধ্যাপক থেকে জনপ্রিয় সাহিত্যিক ও সার্থক চলচ্চিত্র নির্মাতা রূপে নিজের কীর্তির স্বাক্ষর ভাস্বর করা ভবেনবাবুর মেধার পরিচয় ছেলেবেলা থেকেই পাওয়া যায়। প্রতিভাবান এই মানুষটির জীবনের যে যাত্রা নগাঁও শহরে শুরু হয়েছিল তার সমাপ্তি হলো আগষ্ট মাসের ১৩ তারিখ সকাল ১০-০৫ মিনিটে গৌহাটিস্থিত নিউ আর সিতে। ৭১ বৎসরের গৌরবোজ্জ্বল জীবনে পরিসমাপ্তির চূড়ান্ত মুহূর্ত আসার অনেক আগে থেকেই তিনি দুরারোগ্য কর্কট রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। যে কারণে 'কাল সন্ধ্যার' পর তিনি আর কোন ছবি তৈবী করে যেতে পারেননি। অসমীয়া সংস্কৃতি জগতের পুরোধা পুরুষ জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা যে সময় প্রথম অসমীয়া সবাক চলচ্চিত্র নির্মাণে নিয়োজিত ভবেন শইকীয়া তখন সদ্য ভূমিষ্ঠ। সে সময় একথা কল্পনা করাও দুরূহ ছিল যে এই শিশুর কাঁধে ভর করে অসমীয়া চলচ্চিত্র অনেকদূর এগিয়ে যাবে। জ্যোতি প্রসাদ আগরওয়ালা আধুনিক অসমীয়া সংস্কৃতির জনকরূপে শিল্প সংস্কৃতির সমস্ত অঙ্গনেই তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। সেই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যেমন বিষ্ণুরাভা, প্রতিমা বড়ুয়া, ভূপেন হাজারিকার অবদান রয়েছে, তেমনি অসমীয়া সংস্কৃতির ঐতিহ্যের ধারাকে বেগবান করার ক্ষেত্রে ভবেন শইকীয়ার সাহিত্য ও চলচ্চিত্র এক অমোঘ হাতিয়ার। ভবেন শইকীয়ার সৃষ্টির আলোচনা বাদ দিয়ে আজ

অসমীয়া সাহিত্য-সংস্কৃতির আলোচনা অর্থহীন হয়ে পরে। তুখোড় একাডেমিক ক্যারিয়ারের অধিকারী ভবেনবাবু আর অন্য সব স্কলারদের মতই শিক্ষকতাকে পেশারূপে বেছে নিয়েছিলেন। শুরুও করেছিলেন দক্ষতার সঙ্গে। অল্পদিনের মধ্যে জনপ্রিয় 'স্যার' রূপে নিজের পরিচয় অসমীয়া জনগণের মনে গেঁথে দিতে পেরেছিলেন। তারই পাশাপাশি সাহিত্যের অঙ্গনে প্রবেশ করলেন সাহিত্যেও সৃষ্টি করলেন মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির অমূল্য সব দলিল। তার ছোট গল্পের সংকলন 'গহ্বর' এমন সব গল্পের আধার যা পাঠককে অনুসন্ধিৎসু করে তোলে।

সাহিত্য একাডেমি পুরস্কারে সম্মানিত ভবেনবাবু নিজের লেখা কাহিনী নির্ভর চলচ্চিত্রই নির্মাণ করেছেন বেশি। তাঁর প্রথম ছবি 'সন্ধ্যারাগ' প্রাদেশিক ভাষায় নির্মিত শ্রেষ্ঠ ছবি রূপে রজত কমল পুরস্কার পেয়েছে। সাধারণভাবে এর আগে পর্যন্ত অসমীয়া ছবি চলচ্চিত্র বোদ্ধার দৃষ্টি বিশেষ আকর্ষণ করতে পারেনি। সেন্টিমেন্টকে হাতিয়ার করে বাঙালী অভিনেতা অভিনেত্রীদের নিয়ে অসমীয়া চলচ্চিত্রের যে জগৎ সে সময় তৈরী হয়েছিল যার মধ্যে ভূপেন হাজারিকার মত দু'একজনের চলচ্চিত্র কর্ম একটি ব্যক্তিক্রমী প্রয়াস বলেই মনে হতো। অসমীয়া চলচ্চিত্রের সেই জগদ্দল ধারার বাইরে লাগাতর অন্য ধারার ছবি করে তিনি শুধু আজ অসমীয়া চলচ্চিত্র সম্বন্ধে বিশিষ্ট সমালোচক ও চলচ্চিত্র বোদ্ধাদের আগ্রহই সৃষ্টি করেননি পাশাপাশি একদল তরুণ প্রতিভাবান চলচ্চিত্র স্রষ্টাকে নব্যধারায় ছবি তৈরী করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। আজ জাহ্নু বড়ুয়া, গৌতম বরা, রনজিৎ দাস, হেমেন্ত দাস, শান্তনা বড় দলরাই,ভবেন বাবুর যোগ্য উত্তরসূরী রূপে অসমীয়া চলচ্চিত্রকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সদাই সচেষ্ট। 'সন্ধ্যারাগে'র পর আরো ছয়টি ছবি তৈরী করার পর 'কালসন্ধ্যা' তিনি হিন্দিতে করেন। অসমীয়া ভাষায় লিখে, অসমীয়ায় ছবি করে তাঁর মনে হয়েছিল যেন বৃহত্তর ভারতীয় জনগণের মধ্যে অসমীয়া সমাজের সঠিক প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত করা সম্ভব হচ্ছে না। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল অসমীয়া সমাজ জীবনে একদশক ব্যাপী অস্থিরতার প্রভাব। যে অসমের পরিচয় ছিল ব্রহ্মপুত্র ও গন্ডার সেই অসমের নব পরিচিতি হলো উলফা সন্ত্রাস। উলফা নিয়ে নানা কথা কাহিনী। নানা কথাবার্তার মধ্যে উলফার দর্শন, নেতৃবৃন্দ, তাদের সামাজিক পরিবর্তন করার প্রচেষ্টা সবই ইতিমধ্যে সাহিত্যের ও সাংবাদিকদের রম্যরচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই সামাজিক অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে ভবেন শইকীয়ার মত সৃজনশীল মানুষের পক্ষে নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকাটা সম্ভবপর ছিল না। তারই ফলশ্রুতি 'কালসন্ধ্যা' এবং তা আবার হিন্দিতে। 'কাল সন্ধ্যা' নির্মাণের সময় থেকেই তিনি অসুস্থবোধ করেন। পরবর্তীকালে যা মারণব্যাধিতে পরিণতি লাভ করে। শারীরিক অসুবিধা নিয়েও তিনি 'কালসন্ধ্যা' সময়মতই শেষ করেন। ' কালসন্ধ্যা' উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিশেষ করে অসমের উগ্রপন্থী সমস্যা ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে অসমীয়া জনগণের উপর এসবের প্রতিক্রিয়ার এক বাস্তব দলিল রূপেই স্বীকৃতি লাভ করেছে। কালসন্ধ্যার সর্বভারতীয় প্রচার দূরদর্শনের জাতীয় কার্যক্রমের মাধ্যমে হয়েছিল। এছাড়া বেশ কয়েকটি শহরে বাণিজ্যিক ভাবে ছবিটি মুক্তিলাভ করেছিল। অসমীয়া জনগণের বর্তমান সমস্যা এভাবেই তিনি বৃহত্তর নন অসমীয়া মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন। একজন চলচ্চিত্র পরিচালক এর বেশি আর কিই বা করতে পারেন। এই ছবিটিই মণিরত্নমকে 'দিল-সে' করার জন্য প্রাণিত করেছিল কিনা জানি না, তবে তাঁর ছবিতে মণিরত্নম উলফা সমস্যা দেখানোর চেষ্টা করেছিলেন, যদিও সমস্যাটি কতটুকু গুরুত্ব পেয়েছিল তা বিতর্কিত। ভবেন শইকীয়ার 'কাল

সন্ধ্যা' যে উলফা সমস্যা সংক্রান্ত বিষয়টিকে উত্তর পূর্বাঞ্চলের বাইরে কিছুটা হলেও পরিচিত করেছিল,'দিল সে' নিঃসন্দেহে সেই দিশার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

অসমীয়া সাহিত্যে ভবেন্দ্রনাথ শইকীয়ার অবদান অনেকটা বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের মত। শরৎচন্দ্রের লেখনীতে যেমন বাঙালী সমাজের মহিলাদের নিপীড়িত চেহারা প্রাধান্য পেয়েছে সেরকম ভবেনবাবু তার লেখায় অসমীয়া সমাজের মহিলাদের অবস্থান বিশ্লেষণ করেছেন। যদিও সামগ্রিকভাবে ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থান মোটামুটিভাবে একই বিন্দুতে অবস্থিত সেক্ষেত্রে বাঙালী সমাজ ও অসমীয়া সমাজের আপাত কাঠামোতে বিশেষ পার্থক্য নেই, কিছু ব্যতিক্রমী চরিত্র ছাড়া। অসমীয়া সমাজ যা মূলত অহোম-যারা বিশেষজ্ঞদের মতে চীন দেশের সান ধারা উদ্ভুত তাদের প্রাচীন ভাবধারা, বিশ্বাস, আচার আচরণ নিয়েই গড়ে উঠেছে। পরবর্তী সময়ে সমাজ সংস্কারক শংকর দেবের প্রভাবে বৈষ্ণব ধারণার বিকাশ সমগ্র আসাম জুড়েই একটা জোয়ারের সৃষ্টি করেছিল। এই দুই ধারার সঙ্গে বোরোদের প্রভাব অবশ্যম্ভাবীরূপে যুক্ত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে অসমীয়া সমাজ, সংস্কৃতি। সেইসব অনুঘটকের উপস্থিতি বিশ্বায়নের এই সময়ে আপাত দৃষ্টিতে বোঝা খুবই কষ্টকর। তথাপি একটা জাতির অর্ন্তনিহিত বৈশিষ্ট্য সমূহ গভীরভাবে অবলোকন করলেই বুঝতে পারা যায়। অসমীয়া সমাজের অন্তরের অন্তস্থলে অবগাহন করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর হাত দিয়ে এমন কালজয়ী সাহিত্য ও চলচ্চিত্র সৃষ্টি হতে পেরেছে।

বিশাল কর্মময় জীবনে ভবেনবাবু নানা ধরনের লেখা লিখেছেন । এইসব কিছু ছাপিয়ে ভবেনবাবুর সার্থকতা অসমীয়া ছোট গল্পকার রূপেই বেশি। ছোট গল্পের কাহিনী বিন্যাসে যে মুন্সীয়ানার পরিচয় তিনি রেখেছেন প্রায় সেরকম মুন্সীয়ানার ছাপ তাঁর চলচ্চিত্র সমূহে দেখতে পাওয়া যায়। জীবনের প্রায় মধ্যাহ্নে প্রথম ছবি 'সন্ধ্যারাগ' তৈরী করার সময়ই প্রথম তিনি মুভি ক্যামেরা দেখেন। এর আগে মুভি ক্যামেরা সম্বন্ধে তাঁর কোন বস্তুগত অভিজ্ঞতা ছিল না। প্রচন্ড দুঃসাহসিক কাজ । এরপর অত্যন্ত দ্রুত ও দক্ষতার সঙ্গে এই ক্যামেরাটির সঙ্গে তিনি পরিচিতি হোন। সে পরিচয়ের ছাপ পরবর্তী চলচ্চিত্রে দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর পরিচিত, ঘনিষ্ঠজনেরা তাঁকে কর্মবীর বলে থাকেন। যে কোন জিনিষ দ্রুত আত্মস্থ করার ক্ষেত্রে প্রচুর পরিশ্রম ও অনুশীলন তিনি করতেন। আর সেভাবেই নতুন মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টি কলার কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছেন। কর্মই জীবন, এই উপলদ্ধির প্রতি অনুগত ভবেন্দ্রনাথ শইকীয়া জীবনের প্রতিটি মুর্হূত কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে পেরেছিলেন বলেই অনন্য সব সৃষ্টিশীল কাজ করে যেতে পেরেছেন। তাঁর এই সকল কাজের ধারণা পাওয়া যায় তাঁর রোজনামচার শেষ পৃষ্ঠা থেকে।

ভবেন্দ্রনাথ শইকীয়া একজন সার্থক পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক, জনপ্রিয় গল্পকার ও আধুনিক অসমীয়া চলচ্চিত্রের রূপকার। আরো বহুদিন এই কর্মবীর মানুষের সৃষ্টির বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা অসম জুড়ে চলবে। সাহিত্য সংস্কৃতির জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের মুখ উজ্জ্বল করা এই ব্যক্তিত্বের অভাব পূরণ হতে আরো কতদিন অপেক্ষা করতে হয় সেকথা ভবিষ্যতের গর্ভে লুকিয়ে আছে। - শুধু একথা বলা যায় যে এখনই এই শূন্যস্থান ভরাট করে দেয়ার মত ব্যক্তিত্বের বড়ই অভাব, সন্ত্রাসতাড়িত এই উত্তর পূর্ব ভারতে।

চলচ্চিত্রে নভেম্বর বিপ্লব

লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার জনগণের মধ্যে নবজাগরণের চেতনা উন্মেষের লগ্নে চলচ্চিত্রের সৃষ্টিকর্ম জার শাসিত রাশিয়ায় বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। প্রকৃত পক্ষে রাশিয়ার সেই সময়ের সমাজ ব্যবস্থার যে চিত্র দেখা যায় সেখানে জনগণের কাছে পৌঁছনোর মাধ্যমরূপে থিয়েটার যথেষ্টই জনপ্রিয় ছিল। লুমিয়ের ভাইদের সিনেমাটোগ্রাফ আবিষ্কারের মাত্র কয়েকমাস পরই রুশ চলচ্চিত্র তৈরী শুরু হলেও তা সাবালকত্ব অর্জন করে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায়। সেজন্য পরবর্তীকালের প্রতিভাধর অনেক চলচ্চিত্র স্রষ্টাকে প্রাক বিপ্লব সময়ে থিয়েটার করতে দেখা যায়। নভেম্বর বিপ্লব সেসব স্রষ্টাকে উদ্দীপিত করলো নব নব সৃষ্টির উদ্ভাবনে রত হতে। ধীরে ধীরে চলচ্চিত্র মাধ্যমটিতে প্রতিভাধর মানুষেরা তাদের সৃষ্টিকলার স্বাক্ষর রেখে রুশ চলচ্চিত্রকে এক নব পর্যায়ে পৌঁছে দিতে সক্ষম হন। সেই কাজ করতে গিয়ে চলচ্চিত্রে সারা বিশ্বজুড়ে (যদিও খুব কমই উল্লেখযোগ্য কাজ তখন পর্যন্ত হয়েছিল) প্রকৃত মননশীল কাজ সমূহের পর্যালোচনা করে নিজে পরিশীলিত হয়েছেন যেসব চলচ্চিত্রকার সার্গেই আইজেনস্টাইন তাদের অন্যতম। বিশ্ব চলচ্চিত্রের ইতিহাসে রুশ চলচ্চিত্রকে, যার জয়যাত্রা শুরু হয়েছে বিপ্লবোত্ত রাশিয়ায় যিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন সেই আইজেনস্টাইন অকপটে স্বীকার করেছেন পূর্বসূরীদের নিকট তাঁর ঋণের কথা। চলচ্চিত্রের গোড়ায় সে সময়ে হলিউড থেকেও খুব বেশী ভালো ছবি তৈরী হতো না। এরই মধ্যে গ্রিফিথের ইনটলারেন্স বিশ্বের চলচ্চিত্রপ্রেমীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল। প্রথিতযশা রুশ চলচ্চিত্রকাররাও সে ছবির আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন। যে সমস্ত প্রারম্ভিক ছবির মাধ্যমে চলচ্চিত্র শিল্প হয়ে ওঠার উপযুক্ত লক্ষণ প্রকাশ করতে পেরেছিল গ্রিফিথের ইনটলারেন্স তাদের অন্যতম। ১৯১৬ সালে তৈরী এ ছবিটি সোভিয়েত চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে দৃশ্য পর্যায় সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব সৃষ্টি করতে পেরেছিল। ১৯২৪ সালে স্ট্রাইক ছবি করার সময় ঐ একটি ছবিই শিক্ষালাভ করার মত তাঁর সামনে ছিল বলে আইজেনস্টাইন সে ছবির নির্মাতার কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন। পুদভকিনও এই মত সমর্থন করেছেন।

বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় চলচ্চিত্র তখন তার নিজস্বতা খুঁজতে ব্যস্ত। ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে নতুন সমাজ গঠন প্রক্রিয়ায় লেলিন সকলকে নিয়ে চলার কথাই ভেবেছিলেন। সাংস্কৃতিক কর্মীদের

জনগণের প্রতি দায়িত্ববোধের দায়বদ্ধতার কথা স্মরণ করিয়েই নয় শুধু চলচ্চিত্রের আলাদা গুরুত্বের কথাও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বৈপ্লবিক কর্মকান্ডে জড়িত সোভিয়েত জনগণের আত্মত্যাগের ঘটনাবলী সারা বিশ্বের মানুষের মনে পৌঁছে দেয়ার কথাটি তিনি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন বলেই, চলচ্চিত্র নির্মাণ, প্রদর্শন বিপনন সহ সমস্ত ধারাকেই রাষ্ট্রের অধীনে নিয়ে এসেছিলেন। সোভিয়েত চলচ্চিত্রকে বিশ্বের দরবারে সার্থকভাবে পৌঁছে দেয়ার জন্য এগিয়ে এলেন সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পরিচালকরা। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের দশক চলচ্চিত্রের ইতিহাসে সোভিয়েত "সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ" অধ্যায়রূপে চিহ্নিত। আইজেনস্টাইন, পুদভকিন, ডবঝেঙ্কো, ভের্তভ এর মত প্রতিভাশালী স্রষ্টারা এগিয়ে এলেন লেলিনের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি চলচ্চিত্রের মত একটা শক্তিশালী মাধ্যমকে এতকাল যে একতরফাভাবে ব্যবহার করছিল সোভিয়েত রাশিয়ার একঝাঁক প্রতিভাধর চলচ্চিত্র পরিচালক তাদের সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমে সেই প্রচেষ্টার সামনে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালো। সাধারণ মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ চলচ্চিত্র নামক মাধ্যমটিকে ক্রমশঃ সাধারণ মানুষের কাছেই নিয়ে যেতে সক্ষম হলো। প্রকৃতপক্ষে বিপ্লব পূর্ব রাশিয়ায় উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র প্রযোজনার কথা জানা যায় না। অবশ্য সে সময় পর্যন্ত বিশ্বের অন্যান্য দেশেও চলচ্চিত্রের ব্যবহার নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছিল যারমধ্যে নিঃসন্দেহে হলিউড এগিয়েছিল এবং তখনই তারকা প্রথার প্রবর্তন সুকৌশলে শুরু হয়ে গেছে। যদিও হলিউডে তখন কমেডির রমরমা। জার্মানীতে ইতিমধ্যে পোরটাব, গ্রিফিথ চলচ্চিত্রের ব্যাকরণ নিয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু করেছেন এবং তাদেরই প্রভাবে সে সময়টা জার্মান এক্সপ্রেশনিজমের যুগ বলে চিহ্নিত হয়ে আছে। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় চলচ্চিত্র যে গতিলাভ করেছিল সে গতি খুবই সার্থকতার সঙ্গে পরবর্তী সময়ে বিশ্ব চলচ্চিত্রের ওপর যথেষ্টই প্রভাব ফেলতে পেরেছিল। চলচ্চিত্রের ব্যাকরণ ও নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে রুশ চলচ্চিত্রকাররা পরে এসেও চলচ্চিত্র মাধ্যমটিতে তাঁদের আধিপত্য বিস্তার করতে পেরেছিলেন। মনতাজ চলচ্চিত্রকে কাব্যময়তায় ভরিয়ে দেয়, রূপকল্প সৃষ্টি করে চলচ্চিত্র যেন কবিতা হয়ে যায়। চলচ্চিত্রে মনতাজের সদর্থক প্রয়োগ করেছেন রুশ পরিচালক সার্গেই আইজেনস্টাইন। চলচ্চিত্রের এই নতুন দিশা লাভ হয়েছে সোভিয়েত রাশিয়ার বিপ্লব ও বিপ্লবোত্তর সমাজের একান্ত নিজস্ব অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে। বিশ্ব চলচ্চিত্র যদি সোভিয়েত রাশিয়ার কোন সৃষ্টিকল্পের কথা মনে না রাখে তথাপি যতদিন চলচ্চিত্র মাধ্যমটিতে সৃষ্টিশীল ক্রিয়াকান্ড ঘটবে ততদিন মনতাজ বাদ দিয়ে যথার্থ শিল্প সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। মনতাজ নিয়ে আইজেনস্টাইনের ভাবনা চিন্তা চলচ্চিত্র শুরু করার প্রস্তুতিপর্ব থেকেই শুরু হয়ে যায়। তার প্রথম রচনা আকর্ষণের মনতাজ লেফ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁর সারাজীবন ধরে অসংখ্য রচনায় আইজেনস্টাইন মনতাজের নানা বৈশিষ্টের কথা আলোচনা করেছেন। 'দ্য ফিল্মিক ফোর্থ ডাইমেনশন' প্রবন্ধে তিনি চলচ্চিত্র মনতাজের ক্ষেত্রে মাত্রা প্রসঙ্গের অবতারণা করেন। একটি স্থানের যে তিনটি মাত্রা থাকে, তার সাথে আধুনিক বিজ্ঞান তাঁর মতে, সময়ের চতুর্থ মাত্রা যুক্ত করে। এটা কোনো দৈনিক ব্যাপার নয়, রসিকতা নয়। সঙ্গীতের ওভারটোনের মত দৃশ্যেরও এক ধরনের ওভারটোন থাকে। এই ওভারটোন মনতাজের ক্ষেত্রে এই নতুন সংযোজন। এরপর প্রকাশিত হল মেথডস অফ মনতাজ। এই প্রবন্ধে তিনি প্রশ্ন তোলেন , ওভারটোনাল মনতাজ কি চলচ্চিত্র প্রযুক্তিতে কৃত্রিমভাবে আরোপিত ? এটাকে মনতাজের সমস্ত পদ্ধতির বিকাশের

মধ্যে একটা দ্বান্দ্বিক স্তর হিসাবে কি দেখা যায় ? সেই বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি একের পর এক মেট্রিক মনতাজ, রিদমিক মনতাজ, টোনাল মনতাজ, ওভারটোনাল মনতাজ আর ইনটেলেকচুয়াল মনতাজের প্রসঙ্গ এনেছেন। মনতাজ নিয়ে তাঁর নিরন্তর গবেষণা মনতাজকে শুধুমাত্র চলচ্চিত্রের বিষয়রূপে আবদ্ধ রাখেনি, তিনি শিল্পকলার প্রতিটি বিভাগ থেকে উদাহরণ এনে দেখিয়েছেন মনতাজ হচ্ছে চূড়ান্ত কথা। জাপানী নাটক কাবুকির সঙ্গে পোটেমকিন চলচ্চিত্রের বিভিন্ন দৃশ্যের তুলনামূলক আলোচনা করে মনতাজ তত্ত্বের ব্যাখা করেছেন। আইজেনস্টাইনের কাছে চলচ্চিত্র প্রযুক্তির অর্থই হলো প্রথমত ও প্রধানত মনতাজ। তাঁর প্রথম চলচ্চিত্র 'স্ট্রাইক' প্রমাণ করেছে মনতাজের ব্যবহার কত অর্থবহ হতে পারে। আমেরিকা বা ইংল্যান্ডের পর্দায় তখনো মনতাজের এমন ব্যবহার শুরু হয়নি। 'ব্যাটলশিপ পোটেমকিন' চলচ্চিত্রে এসে আইজেনস্টাইনের মনতাজ মুগ্ধ বিস্ময়ে হতবাক করে দিলো চলচ্চিত্র বোদ্ধাদের। ওদেসা সিঁড়ির দৃশ্য কিভাবে তুলতে হবে বা কিভাবে মনতাজে আনতে হবে মূল চিত্রনাট্যে এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ ছিল না। ওদেসা সিঁড়ি দেখার পর দৃশ্যটি সম্পর্কে ভাবনার সৃষ্টি করে ও কল্পনার প্রেরণা যোগায়। তাঁর নিজের কথায়, বিশেষ এই দৃশ্যে বিভিন্ন চরিত্র তথা জনতার বিহ্বল অবস্থার কথা বাদ দিয়ে আমরা শুধু দেখাব কিভাবে এখানে গতিকে আবেগের ক্রম আরোহণ প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। শুরুতে ক্লোজআপে কিছু মানুষের বিশৃঙ্খল দৌড়াদৌড়ি। এরপর লঙশটে সেই একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি। কিন্তু পরের কয়েকটি দৃশ্যে আগেকার বিশৃঙ্খল গতির জায়গায় এলো সৈন্যদের পায়ের কিছু শট। বন্দরের সিঁড়ি দিয়ে ছন্দোবদ্ধ পদক্ষেপ, তারা নামছে। এখানে লয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছন্দও বাড়তে থাকে। এই অবরোহী গতি তার অন্তিম বিন্দুতে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই আচমকা হল দিক পরিবর্তন। সিঁড়ি বেয়ে ছত্রভঙ্গ, পলায়নপর জনতার ভীড়ের জায়গা নিল মৃতপুত্র কোলে হতভাগ্য নিঃসঙ্গ জননীর মূর্তি। ধীর, বিষন্ন পদক্ষেপে সিঁড়ি বেয়ে তিনি উঠছেন। ছত্রভঙ্গ জনতার ব্যস্ততায় গতি অবরোহী। তারপর হঠাৎ নিঃসঙ্গ প্রতিমা, ধীর বিষন্ন। এবারে গতি আরোহী। কিন্তু মুহূর্তমাত্র তার স্থায়িত্ব। আবার আকস্মিক দিক পরিবর্তন। বিপরীত গতি। অবরোহণ। দ্রুততর ছন্দ নিয়ে আসে বর্ধিত লয়। আবার হঠাৎই ধাবমান জনতার এই দৃশ্যকে অনুসরণ করে আসে সিঁড়ি বেয়ে গড়িয়ে পড়া প্যারাম্বুলেটর এর দৃশ্য। এবার কেবল লয় পরিবর্তন নয়। উপস্থাপন পদ্ধতিরও পরিবর্তন ঘটে। বিমূর্ত থেকে বস্তুগত। অবরোহী গতির এ হল আরেক দিক। মনতাজের এমন সফল ব্যবহারই দৃশ্যটিকে মানুষের হৃদয়ে স্থান করে দিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে দেশ, বিদেশের বহু সাধারণ মানুষ ওদেসা বন্দরের সিঁড়ি দেখার জন্য ছুটে গেছেন। শুধু তাই নয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে আজ বোধহয় এমন কোন গ্রন্থ নেই যেখানে ওদেসা বন্দরের লম্বা বিশাল চওড়া সিঁড়ির আলোচনা থাকেই।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসের ব্যাখ্যার মূল কথাই হচ্ছে মানুষ। সমাজ মানুষই ইতিহাসের স্রষ্টা। এই চিন্তার সঠিক প্রয়োগ লক্ষ্য করা গেলো আইজেনস্টাইনের প্রথম ছবি স্ট্রাইকে। এই ছবিতে প্রথম দর্শক পরিচিত হলেন মাস হিরোর সঙ্গে। চলচ্চিত্রের পর্দায় বিশেষ কোন এক ব্যক্তি নয় জনসাধারণ নায়ক হিসেবে দেখা দিলেন। আইজেনস্টাইনের চলচ্চিত্রের এ এক বিরল বৈশিষ্ট্য, যা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রাক বিপ্লব শ্রমিকশ্রেণীর কার্যকলাপ যে রুশ জনগণের মধ্যে বিপ্লবী চেতনা উদ্দীপিত করতে পেরেছিল সে কথারই যথার্থ প্রতিফলন

ঘটেছে তাঁর চলচ্চিত্রে। মানুষ, শুধুমাত্র মানুষই যে পারে বিশৃঙ্খল সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন কাটিয়ে সুশৃঙ্খল সামাজিক অবস্থানের পরিবেশ সৃষ্টি করতে এমন দৃশ্যায়ন এর আগে দেখা যায়নি চলচ্চিত্রে ইতিপূর্বে জনসাধারণের সক্রিয় অংশ গ্রহণের কথাও শোনা যায়নি। তাঁর 'ব্যাটলশিপ পোটেমকিন'' ইভান দ্য টেরিবল'-প্রতিটি ছবিই সে কথা বলেছে। ১৯০৫ সালে ঘটা প্রিন্স পটেমকিন তাভরিচেসিক যুদ্ধ জাহাজের নাবিকদের জার এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঘটনাকে নির্ভর করে তৈরী 'ব্যাটেলশিপ পটেমকিন' বিশ্বস্ততার সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবপর্ব মানসিকতার সফল বাস্তব চিত্রায়ন। যেখানে অত্যাচারের সময় শ্রমিকশ্রেণীর পাশে এসে দাঁড়ায় জনসাধারণ। যাদের মানসিকতায় চেতনায় তখন শুধুই বিপ্লব। কামনায় শুধু মুক্তি। এই চেতনার কথা চলচ্চিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে দেশ, ভাষার গন্ডি পেরিয়ে নিপীড়িত, লাঞ্ছিত মানুষকে উদ্দীপিত করে। ভাবায়। এই ছবির মাধ্যমে আইজেনস্টাইন সার্থকভাবে বিভিন্ন বুর্জোয়া দেশে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন শ্রমিকশ্রেণীর মৈত্রীর চিন্তা, বিপ্লবী ভ্রাতৃত্বের অঙ্গীকার। শিল্পের জন্য শিল্প তত্ত্বের অসারতা প্রমাণিত হলো, সৃষ্টি হলো জীবনের জন্য শিল্প তত্ত্ব। যে কথা পরবর্তী সময়ের এক গরিষ্ঠাংশ চলচ্চিত্র কর্মীকে উদ্বুদ্ধ করেছে।

আইজেনস্টাইনের পাশাপাশি সমাজতান্ত্রিক চিন্তা -ভাবনার সফল প্রতিফলন চলচ্চিত্রে ঘটাতে এগিয়ে এলেন আরো অনেক প্রতিভাধর চলচ্চিত্রকর্মী। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন পুদভকিন, ডভঝেঙ্কো, শেমগেলেয়া, চিয়াউরেলি, বেক নাজারভ। তাদের ছবির মধ্যে যেমন রয়েছে বিপ্লবের মহিমা তেমনি নতুন সমাজ গড়তে গিয়ে মানুষ যেসব সমস্যা ও দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হচ্ছেন তার সঠিক প্রতিফলন। ঐ সময়ের ছবিগুলোর বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মহাকাব্যধর্মী বিস্তার ও ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুর অত্যন্ত বিশ্বস্ত, জীবন্ত ও সত্যনিষ্ঠভাবে তুলে ধরার প্রয়াস। ডভঝেঙ্কোর ' শখরস' ইউতকেভিচের 'বন্দুকধারী মানুষ' মিখাইল রম-এর লেনিন বিষয়ক ছবি - ''অক্টোবরে লেনিন''। ১৯১৮-তে লেনিন, যথেষ্ট জনপ্রিয় ছবি। পাশাপাশি সমাজতন্ত্রের জল হাওয়ায় যে নতুন প্রজন্ম বেড়ে উঠছে তাদের নিয়ে নির্মিত হলো গেরাসিমভের 'সাতজন সাহসী মানুষ' ও কমসোমল লুকভের মহাজীবন। এইসব চলচ্চিত্রকারদের সৃষ্টির মাধ্যমে সোভিয়েত চলচ্চিত্র পরিপূর্ণভাবে মানুষের বিজয়গানের ধ্বজা উড়িয়ে চলতে লাগলো। এরই সঙ্গে শুরু হলো নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা। চল্লিশের দশকের শুরুতে ফ্যাসিস্ত আগ্রাসনের সময় সোভিয়েত চলচ্চিত্র নতুন এক দিগন্তের উন্মোচন ঘটায়। নিউজরীলের প্রাধান্য বাড়িয়ে দেবার জন্য ক্যামেরা হাতে নিয়ে কলাকুশলীরা পৌঁছে গেলেন যুদ্ধক্ষেত্রে। ঐতিহাসিক ঘটনার ছবি তুলতে গিয়ে নিহত হয়েছেন অনেক। রণাঙ্গনের দৃশ্যসমূহ নিয়ে পরবর্তীকালে সৃষ্টি হয়েছে বহু দলিল সদৃশ তথ্যচিত্র যা ঐ সময়ে যুদ্ধরত সৈনিকদের মনোবল বাড়াতে সহায়ক হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত যে রুশ সৈনিকরা জয়ী হবেন এই আশা উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে পেরেছিল সেসব ছবি। পরবর্তী দশকে নতুন পরিচালকের আবির্ভাবের সঙ্গে চলচ্চিত্র শিল্প নতুন নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা ও সৃষ্টির দিকে মোড় নেয়। এ সময়ের উল্লেখযোগ্য যে সব চলচ্চিত্রকার নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন তারা গ্রিগরি চুখরাই, সের্গেই বন্দারচুখ, মিখাইল কালাতোসোভ এবং আন্দ্রেই তারকোভস্কি।

বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় চলচ্চিত্র রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে নিরন্তর সৃষ্টিমূলক ক্রিয়াকান্ডের মাধ্যমে বিশ্ব চলচ্চিত্রে এক সম্মানজনক স্থান দখল করতে পেরেছিল। শুধুমাত্র ছবি তৈরী করা নয় চলচ্চিত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রায় সমস্ত বিভাগে তাদের শ্রেষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন।

চলচ্চিত্র বিষয়ে রচনা ও গবেষণার ক্ষেত্রে কুলেশভ, পুদভকিন, ভের্তভ, কারামাজভ প্রমুখদের অবদান অনস্বীকার্য। সবার চেয়ে অগ্রণী হয়ে আছেন সার্গেই আইজেনস্টাইন। যিনি শুধু চলচ্চিত্র পরিচালকই নন, প্রকৃত অর্থে ছিলেন চলচ্চিত্রের এক সার্থক শিক্ষক। চলচ্চিত্র নির্মাণের পাশাপাশি যিনি অবিরত ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর ছবিতে ব্যবহৃত তারই নতুন কোন তত্ত্ব। আইজেনস্টাইনের মেধা শ্রম নিষ্ঠা ও দার্শনিক বিশ্বাস থেকে সৃষ্ট চলচ্চিত্রের ব্যাকরণ, সমৃদ্ধ করেছে সমগ্র চলচ্চিত্র সৃষ্টিকেই। লেনিনের চলচ্চিত্র সম্পর্কিত চিন্তাভাবনায় প্রভাবিত হয়ে স্থাপত্য কলার প্রকৌশলী থিয়েটার প্রেমী, আইজেনস্টাইন-চলচ্চিত্রকে তার প্রতিভা স্ফুরণের ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়ে চলচ্চিত্র মাধ্যমটিকে যে উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছেন তা থেকে তিনি যে তার যুগের বিরাট বিপুল, সামাজিক প্রয়োজন সম্পাদন করতে পেরেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সোভিয়েত রাশিয়ার চলচ্চিত্র মাধ্যমটির এই উত্তুঙ্গ অবস্থানে আরোহণ করার মূল প্রেরণা কিন্তু রুশ বিপ্লব।

রুশ বিপ্লবের পর অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে আমাদের দুনিয়ায়। পরিস্থিতির প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে। সব কিছুর মধ্যেও মানুষের মুক্তির তীব্র আকাঙ্খার মৃত্যু হয়নি এখনও। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নিত্য নতুন লাগাতর প্রচেষ্টার মধ্যেও মানুষ এখনও বিশ্বাস করে রুশ বিপ্লবের মত আরেকটা বিপ্লব হবে এবং তখনই ঘটবে প্রকৃত শোষণ মুক্তি। সেই মুক্তির লক্ষ্যে পৃথিবী জুড়ে যে সংগ্রাম চলছে ক্রমে যা আরও তীব্রতা লাভ করবে সেই সংগ্রামের হাতিয়াররূপে চলচ্চিত্র নিঃসংশয়ে এক শক্তিশালী হাতিয়ার। চিলির পরিচালক বিশ্বাস করেন "জনসাধারণের মুক্তি সংগ্রামই হবে আমাদের চলচ্চিত্র নির্মাণের কেন্দ্রীয় বিষয়। চলচ্চিত্রকারদের এই সদিচ্ছার সঙ্গে জনগণের বিপ্লবী চেতনা যুক্ত হয়ে জন্ম নেবে নতুন চলচ্চিত্রের নন্দনতত্ত্ব।" চলচ্চিত্রের প্রতি এই সুতীব্র আকাঙ্খার জন্ম হয়েছে সোভিয়েত রাশিয়ার বিপ্লবের গর্ভে। সামাজতন্ত্রী সোভিয়েত ইউনিয়ন বাস্তবে খণ্ডিত হয়ে গেলেও মানুষের বিশ্বাসে, চিন্তায় ও চেতনায় সমাজবাদী রাশিয়া এখনও ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক। বিপ্লবের সার্থকতা এখানেই।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আঞ্চলিক সিনেমা

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত রাজ্যসমূহের মধ্যে চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রচেষ্টা সর্বপ্রথম অসমের গুয়াহাটি শহরে শুরু হয়। এই অঞ্চলে বসবাসকারী বহুধা বিভক্ত মানুষের মধ্যে অসমীয়া ভাষীদেরই প্রথম চলচ্চিত্রের জাদুকরী প্রভাবের অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছিল। অসমীয়া শিল্প সংস্কৃতির প্রাণ পুরুষ জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা ১৯৩৫ সালে সবাক চলচ্চিত্র নির্মাণ করে চলচ্চিত্র শিল্পের সূচনা করেন। সে সময় সর্বত্রই চলচ্চিত্র মাধ্যমটিকে জানা ও বোঝার ক্ষেত্রে অনুভূতিপ্রবণ শিল্পীদের কৌতূহলী করে তুলেছিল। সে সকল প্রতিভাবান শিল্পী যারা গণনাট্য সংঘের পতাকাতলে সারা দেশজুড়ে সুস্থ ও সচেতন সংস্কৃতি বিকাশের আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন তাদের দৃষ্টিও আকর্ষিত হয়েছিল চলচ্চিত্র মাধ্যমটিতে। প্রাদেশিক সিনেমা এমনকি তখনকার হিন্দি সিনেমার ক্ষেত্রেও গণনাট্য সংঘের শিল্পীদের উপস্থিতি, পরিচালনা, অভিনয়, সঙ্গীত পরিচালনার প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা গেছে। পূর্বোত্তরের মধ্যে সেই প্রভাব একমাত্র আসামকেই স্পর্শ করতে পেরেছিল। যে কারণে শুধুমাত্র স্বতন্ত্র ভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃতির জন্যই নয় অসমীয়া জনমানসে গণনাট্য সংঘের মত ভারতীয় সংস্কৃতির দিক নির্ণয়কারী সংগঠনের প্রত্যক্ষ প্রভাবও চলচ্চিত্র নামক মাধ্যমটির বিকাশের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে। ভারতীয় সংস্কৃতির সুস্থ বিকাশের ধারাকে সদর্থকভাবে পরিচালিত করার অঙ্গীকার নিয়ে জ্যোতি প্রকাশের পথে সিনেমাকে বহুদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে ভূপেন হাজারিকা, ভবেন্দ্রনাথ শইকীয়া থেকে জাহ্নু বড়ুয়া, সান্তনা বরদলইর মত চলচ্চিত্রকাররা প্রতিনিয়ত তাদের সৃষ্টিকর্মের সাহায্যে সচেষ্ট হয়েছেন। আর সে কারণেই সদর্থকভাবে একমাত্র আসামেই সিনেমা ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে গড়ে ওঠার প্রক্রিয়াসমূহ অতিক্রম করতে পেরেছে। তারই পাশে অসম সরকারের সহানুভূতিমূলক সিদ্ধান্তসমূহ সিনেমাকে শিল্প হিসেবে বেড়ে ওঠার কাজে উৎসাহ জুগিয়েছে। গত প্রায় সত্তর বছর ধরে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার চড়াই-উতরাই পেরিয়ে অসমীয়া সিনেমা এখন সমান্তরাল দুই ধারায় নিয়মিত চলচ্চিত্র নির্মাণ করে চলেছে। সবচেয়ে আশার কথা হলো, ভিন্ন ধারায় চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে পর পর প্রতিভা স্ফুরণের ধারাবাহিকতা অসমীয়া সিনেমাকে ক্রমশঃ এক উন্নত মাত্রায় পৌঁছে দিতে পারছে। সেই ধারাবাহিকতা যা প্রকৃত অর্থে গতিলাভ করেছে ভবেন্দ্রনাথ শইকীয়ার সৃষ্টির মাধ্যমে। তাঁর প্রথম ছবি 'সন্ধ্যারাগ'-এ সামাজিক

পারিবারিক সত্যের এমন একটা মাত্রা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে যা এর আগে অসমীয়া তো বটেই এমনকি বাংলা ছবিতেও প্রতিফলিত হয়নি। ১৯৭৮ সালে তৈরী সন্ধ্যারাগ তাঁরই বাণপ্রস্থ গল্পের চলচ্চিত্রায়ণ। ভবেনবাবু আটটি কাহিনীচিত্র নির্মাণ করেছেন যার মধ্যে একটি হিন্দি ভাষায়। 'কাল সন্ধ্যা' ছবিতে তিনি উলফা সমস্যায় ভারাক্রান্ত অসমীয়া সমাজের বাস্তব চিত্রায়ন ঘটিয়েছেন। ভবেনবাবু তাঁর ছবিতে প্রতিদিনের জীবনের সামান্য পরিবেশ ও ঘটনা এমন নিষ্ঠায়, এমন যত্নে জড়ো করে যান যা দর্শককে প্রদর্শিত জীবনের প্রতি মমত্ববোধ জাগিয়ে তোলে। ভবেন শইকিয়া ও পরবর্তী প্রজন্মের চলচ্চিত্র নির্মাতাদের হাতে অসমীয়া চলচ্চিত্র এক সুনির্দিষ্ট স্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছে। এরই পাশে মধ্য মেধার চলচ্চিত্র নির্মাতাদের হাতে তথাকথিত প্রমোদ উপকরণ সমৃদ্ধ সস্তা, চটুল ছবিরও সৃষ্টি হচ্ছে। উভয় ধারা মিলে বছরে দশ বারোটা ছবি তৈরী হয়ে অসমীয়া চলচ্চিত্র আঙ্গিনাকে প্রাণচঞ্চল, সৃষ্টি সুখে ব্যস্ত রেখেছে। এই ধারাবাহিক কর্মযজ্ঞ ও তারই পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ারূপে গড়ে ওঠা 'জ্যোতি চিত্রের' আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহার ও প্রদর্শনীস্তরে সরকারী আনুকুল্যে সব মিলে মিশে বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ভাষাগোষ্ঠী মানুষের বাসভূমি অসম খুব স্বাভাবিকভাবেই উত্তর পূর্বাঞ্চলের সার্থক চলচ্চিত্র নির্মাণের কেন্দ্ররূপে চিহ্নিত হতে পেরেছে।

অসমীয়া ছবির পরই এ অঞ্চলের অপর ছবি করিয়ে রাজ্য হিসেবে মণিপুর উঠে এসেছে। দেবকুমার বসু নির্দেশিত ১৯৭১-৭২ সালে প্রথম মণিপুরী ছবি 'মাতমগি মণিপুর' তৈরী হয়। মণিপুরী ছবির প্রতি বহির্বিশ্বের আগ্রহ জেগে ওঠে আশির দশকের গোড়ায় অবিরাম শ্যামশর্মা পরিচালিত 'ইমাগি নিংথেম' থেকে। সেই সময় সারা মণিপুরজুড়ে সিনেমা হলের সংখ্যা ছিল গোটা পঁচিশ। এতো সীমিত প্রদর্শন ব্যবস্থার মধ্যেও মণিপুরী সিনেমার সৃষ্টিকর্ম বন্ধ হয়ে যায়নি। রাজ্য সরকার চলচ্চিত্র নির্মাণকে উৎসাহিত করতে সদর্থক ভূমিকা পালন করে চলেছেন সেই আশির দশক থেকে। মণিপুর ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন শুধুমাত্র চলচ্চিত্র নির্মাণে আর্থিক সহায়তা করে দায়মুক্ত না হয়ে, চলচ্চিত্র সংক্রান্ত শিক্ষার ব্যবস্থাও করে থাকে। তারই ফলস্বরূপ মণিপুরী সিনেমা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল মহলের আগ্রহ এখনও লক্ষ্য করা যায়। ইমগির বিশ্ব স্বীকৃতিই যে মণিপুরের চলচ্চিত্রকে হঠাৎ পৃথিবীর দৃষ্টির কেন্দ্রে এনে দাঁড় করিয়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মণিপুরী সিনেমার বিশেষত্ব প্রসঙ্গে ফরাসি পত্রিকা 'কাহিয়ে দ্যু সিনেমা'র প্রতিনিধির ইমাগি নিংথেম সম্বন্ধে প্রতিক্রিয়া প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, 'ইমাগি'তে চলচ্চিত্র যেন ফিরে গেছে তার সেই দ্যুতিদীপ্ত জন্মলগ্নে। যখন চলচ্চিত্র মানুষের চলন, চাহনি, চমকে মুগ্ধ হয়ে ছবির মধ্যে তাকে বহুমূল্য সম্পদের মতো অনন্তকালের জন্য রক্ষা করার সাধনায় মগ্ন, যখন কথা এসে সেই কঠোর সাধনার দায়কে লাঘব করেনি, চলচ্চিত্রের এই আদি শুদ্ধতার দর্শনই মণিপুরী চলচ্চিত্রের বৈশিষ্ট্য। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র অবিরাম শ্যামশর্মার হাত ধরে তৈরী হওয়া মণিপুরী চলচ্চিত্রের বিজয়রথ আজও পরবর্তী প্রজন্মের হাত ধরে এগিয়ে চলেছে। ব্যাপক হিংসা ও অস্থিরতার মধ্যে নিমজ্জিত মণিপুরী সমাজের টানাপোড়েন সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়ে মণিপুরী চলচ্চিত্রকে সজীব করে রেখেছে। সেই ধারাবাহিকতা ক্ষীণ হলেও বয়ে চলেছে এখনও। মণিপুরী চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে এটাই আশার কথা।

ভারতীয় সংবিধানে যে সকল ভাষাকে ভারতীয় বলে স্বীকার করা হয়েছে তাদের প্রত্যেকেরই সমান সম্মান। তথাপি বহুভাষার দেশ ভারতে ভাষার নির্মম ব্যবধান ঘোচাতে হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা

হিসাবে তুলে ধরা হলো। বাকী সব ভারতীয় ভাষা হয়ে গেল আঞ্চলিক ভাষা। হিন্দি ছবিতে ব্যবহৃত হিন্দি ভাষা সারা ভারতে অত্যন্ত বোধ্য তাঁর সহজবোধ্য তার গুণে। তাঁর শব্দ দারিদ্র্যেব তারই সঙ্গে চলেছে খবরের কাগজে, নিত্যনতুন রঙিন পত্রিকায় হিন্দি ছবি ও তার তারকা লীলাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে হিন্দি ছবিকে আরও প্রভাবশালী করে তোলার চেষ্টা। এই সবের সঙ্গে লাগাতর টেলিভিশনের হাজারটা চ্যানেলে শুধু হিন্দি ভাষায় বাস্তববর্জিত চব্বিশ ঘন্টা প্রদর্শিত অনুষ্ঠানসমূহের সাহায্যে একথাই প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা চলেছে যে হিন্দি ছাড়া, ভারতীয়ত্ব হয় না। অলীক চিত্রনাট্য সমৃদ্ধ নাচ,গান, মারপিট, ধর্ষণের দৃশ্য সম্বলিত হিন্দী সিনেমাই এখন ভারতীয় মূল সিনেমারূপে স্বীকৃত। তারই ফলে ভারতীয় সংস্কৃতি ও জীবনবোধ প্রতিফলিত চলচ্চিত্র সমূহ আঞ্চলিক ছবির তকমা নিয়ে একটা ক্ষুদ্র দর্শক সমাজের কাছে পরিবেশিত হওয়ার সুযোগ পায়। অথচ বাংলা, কন্নড়, মালয়ালম, অসমীয়া, মণিপুরী ছবিতে অঞ্চল বিশেষের সংস্কার জীবনচর্যা সমস্যা উপজীব্য করে ছবি তৈরী করেই এইসব পরিচালকরা দেশ এবং বহির্বিশ্বের দর্শকদের নাড়া দিয়েছেন। উত্তর পূর্বাঞ্চলে বসবাসকারী আরো যেসব ভাষা গোষ্ঠীর মানুষ রয়েছেন তাদের কাছে এই আঞ্চলিকতা বিষয়টাও কেমন যেন অধরা। সাংবিধানিক স্বীকৃতির বাইরে অথচ ভৌগলিক অর্থে আলাদা অঞ্চলরূপে গড়ে ওঠা আদিবাসী অধ্যুষিত রাজ্যের ভাষাও তাই আঞ্চলিক ভাষার স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য। চলচ্চিত্রের দর্শকের নিরীখে আরও ক্ষুদ্র সে বাজারের জন্য চলচ্চিত্র নির্মাণের কথা কখনই তথাকথিত ভারতীয় মূলস্রোতের চলচ্চিত্র নির্মাতাদের চিন্তা-ভাবনায় স্থান পায়নি। অথচ অতিথি বৎসল, সরল, জীবনধারণে অভ্যস্ত নিজস্ব সংস্কৃতির ঐতিহ্যে লালিত এক বিশাল আদিবাসী সমাজের জীবন সংগ্রামের কথা ভারতীয় চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। ভারতীয়বোধ শুধুমাত্র হিন্দি ছবির প্রসার ঘটিয়েই যে জাগিয়ে তোলা সম্ভব নয় সে কথা উত্তর-পূর্বাঞ্চলজুড়ে ঘটে চলা বর্তমান কার্যকলাপ থেকেই স্পষ্ট। মণিপুরী সিনেমা বিশেষ করে 'ইমাগী নিংথেম'-এর সাফল্য আদিবাসীদের জীবন নির্ভর চলচ্চিত্র নির্মাণে নিঃসন্দেহে প্রেরণা জুগিয়েছে। তারই ফলস্বরূপ আদিবাসীদের জীবন নিয়ে তাদের ভাষায় আদিবাসী নন এমন মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণে নির্মিত চলচ্চিত্রসমূহ পরবর্তী চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে দিক নির্ণয় করে দিতে পেরেছে। এমন একটা সামাজিক পরিস্থিতির সময়ে এ ধরনের ছবি নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে যে সময় প্রকৃত অর্থেই সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ছেয়েছিল চরম অস্থিরতা ও অবিশ্বাসের দাবানল। সেই প্রেক্ষাপটে নির্মিত এই অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষায় নির্মিত চলচ্চিত্রসমূহ সামাজিক কর্তব্য পালনেরই নমুনামাত্র। একথা সর্বজনবিদিত যে, পূর্বোত্তর ভারতে অসম ও মণিপুর ছাড়া প্রকৃতপক্ষে ধারাবাহিক চলচ্চিত্র নির্মাণ ও চলচ্চিত্র চর্চার কাজ আর কোথাও হয় না। এই দুই ধারার বাইরে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বসবাসকারি আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে নির্মিত হয়েছে কিছু ব্যতিক্রমী ছবি। যে ছবিগুলো প্রকৃতই অন্য এক সমাজের চালচিত্র ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। প্রকৃত সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রকৃত মানুষের প্রকৃত ঘটনার বর্ণনা থেকে পুদোভকিনের অভিনেতা সম্পর্কে মন্তব্যরই যথার্থতা প্রমাণ করে। তিনি বিশ্বাস করতেন তাঁর অভিনেতারা শারীরিক এবং মানসিকভাবে চরিত্রটির সঙ্গে একাত্ম হবে। সে কারণে তিনি তাঁর অভিনেতাদের খুঁজেছেন কৃষিক্ষেত্রে, কারখানায় ও রাস্তায়। পুদোভকিনের এই ধারণাটি আইজেনস্টাইনের 'মাস হিরো' (জনগণ নায়ক) ধারাকেই পুষ্ট করে। হলিওডের নায়ক-নায়িকা নির্ভর একক সুখ অভিলাষী, স্বার্থ সর্বস্ব ধারণার একেবারে বিপরীত

আদর্শের জন্ম হয় ষ্ট্রাইক ছবি থেকে। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় লেনিনের পরামর্শে অন্যান্য শিল্প মাধ্যমের মত চলচ্চিত্রও শোষণহীন মুক্ত সমাজ গঠনে মানুষকে প্রাণিত কবাব কাজে ব্যবহার হতে থাকে। ভিন্ন সমাজের জন্য আলাদা ছবি তৈরীর যে আদর্শ সে সময় ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে তা আজও যথেষ্ট সমাদৃত। আদিবাসী সমাজের প্রেক্ষাপটে নির্মিত এ ধরনের ছবি তৈরীর শ্যুটিং পর্যায়ের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রকৃত মানুষেব সক্রিয় অংশগ্রহণ চলচ্চিত্রকে শুধুমাত্র পরিচালক বা অভিনেতার শিল্প সৃষ্টি বলে চিহ্নিত করতে পারে না। চলচ্চিত্রটিকে ধীরে ধীরে তৈরী হতে সাহায্য করার মাধ্যমে আদিবাসী সমাজও চলচ্চিত্র নির্মাণের একটা পর্যায় পর্যন্ত সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। ভারতীয় সমাজের একেবারে প্রান্তিক সীমানায় বসবাসকারী ভাষাগতভাবে সংখ্যালঘু এইসব মানুষের জীবনবোধের কথা তাদেরই ভাষায় চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত করা তাদের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া সম্ভব নয়। পেশাদারী অভিনেতার পক্ষে জুমিয়া কৃষকের ব্যথা-বেদনা স্পষ্ট ফুটিয়ে তোলা বাস্তবিকই অসম্ভব। সে কারণে এ ধরনের ছবি তৈরীর ক্ষেত্রে প্রকৃত জুমিয়াকেই জুমচাষীর ভূমিকায় অভিনয় করতে হয়। যা প্রকৃতপক্ষে অভিনয় নয় মোটেও। এই ধরনের চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রথম প্রয়াসরূপে আত্মপ্রকাশ করে ইউ তিরৎ সিং। সাতের দশকে খাসি ভাষায় ষোল মিমিঃ এ তৈরী ঐ ছবিটাই পূর্বোত্তরে প্রথম আদিবাসী ভাষায় আদিবাসী জীবনেব আদিবাসী অভিনিত এবং পরিচালিত প্রথম ছবি। ইউ তিরৎ সিং খাসি ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের জাতীয় বীর। ব্রিটিশ পলিটিকেল এজেন্ট ডেভিড স্কটের আগ্রাসনকে দীর্ঘদিন সশস্ত্র যুদ্ধ করে রুখে দিয়েছিলেন নংক্লাওয়ের সিয়েম ইউ তিরৎ সিং। সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত ব্রিটিশ সামরিক অধিকর্তা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসার প্রস্তাব দিয়ে ছল করে তিরৎ সিংকে ধরে ঢাকা জেলে বন্দী করে রাখেন। সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। সবেমাত্র অসম থেকে আলাদা হয়ে নতুন রাজ্য মেঘালয় সৃষ্টি হয়েছে। সে সময় খাসিদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ উদ্দীপিত করার জন্য এমন এক স্বাধীনচেতা বীরযোদ্ধার কথা চলচ্চিত্রায়নই স্বভাবিক। দ্বিতীয় আদিবাসী ছবি 'মানিক রাইতং'। খাসি ভাষার দ্বিতীয় ছবিটি যথেষ্ট উন্নতমানের চলচ্চিত্র সৃষ্টিরূপে সারাদেশেই নন্দিত হয়েছে। পরবর্তী আদিবাসী জীবন নির্ভর ছবি তৈরী হয় ত্রিপুরায়। রিয়াংদের জীবন নির্ভর ককবরক ভাষার ছবি 'লংতরাই'। ত্রিপুরা রাজ্যে নির্মিত প্রথম কাহিনীচিত্র। এরপর ডিমাসাদের জীবন নিয়ে ছবি 'ওসো বিপু' তৈরী হয়। প্রায় সেইসঙ্গে একের পর এক তৈরী হতে থাকে ককবরকে 'লালমণি হাদুক' 'বড়োতে হাগরা মায় হাও জেনা হারি, 'আলায়ারন'। এরই পাশে গারো ভাষায় তৈরী হয় আরও দুটো ছবি। এতগুলো ছবির মধ্যে একমাত্র খাসি ভাষাটাই অস্ট্রিক গোষ্ঠীভুক্ত বাকী সবই বড়ো ভাষাগোষ্ঠীর হওয়া সত্ত্বেও এই অঞ্চলের মানুষ এই সব ছবি সম্বন্ধে অজ্ঞাত রয়ে গেছেন। এই সকল সৃষ্টিকর্মের পাশে ত্রিপুরা থেকে বেশকিছু বাংলা ভাষায় ছবিও তৈরী হয়েছে।

সংখ্যার নিরিখে অল্প সময়ের মধ্যে ত্রিপুরা থেকে যথেষ্ট উৎসাহব্যঞ্জক ছবি তৈরী হলেও সরকারী-বেসরকারী কোন স্তরেই সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গী চলচ্চিত্রকে শিল্পরূপে গড়ে তোলার জন্য পরিলক্ষিত হয়নি। চলচ্চিত্র শিল্প হিসেবে গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিবেশ এবং পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেনি বলে চলচ্চিত্র চর্চা এখানে বন্ধই হয়ে গেছে। ইদানিং অবশ্য কিছু ভিডিওগ্রাফি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছে যার মধ্যে 'মাথিয়া' অন্যতম।

বিক্ষিপ্তভাবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলজুড়ে এ ধরনের চলচ্চিত্র নির্মাণ একটা সংগঠিত রূপ লাভ করতে

পারেনি নানা কারণে। সে সকল কারণের মধ্যে যা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো প্রদর্শন ব্যবস্থা। আমাদের দেশে চলচ্চিত্রের প্রদর্শন ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণভাবে বেসরকারী মুনাফালোভী ব্যবসায়ীরা নিয়ন্ত্রণ করে। যাদের কাছে ছবির শিল্পগত মূল্য একদমই নেই। যারা বিশ্বাস করেন চলচ্চিত্র একটি বিক্রিযোগ্য পণ্যমাত্র। চলচ্চিত্রটিকে সুন্দর মোড়কে পুরে নতুন কায়দায় বিজ্ঞাপিত করে মানুষকে আকর্ষণ করে মুনাফা করাই এই সমস্ত পরিবেশকদের একমাত্র উদ্দেশ্য। খুব সভাবিকভাবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আদিবাসী সমাজ নির্ভর ছবিগুলো প্রতিষ্ঠিত পরিবেশকদের দৃষ্টির বাইরে থেকে যায়। রাষ্ট্রীয় চলচ্চিত্র নিগমের চলচ্চিত্র বিকাশের উদ্দেশ্যের মধ্যে প্রেক্ষাগৃহ তৈরী হওয়ার প্রকল্পটি এ অঞ্চলে ব্যর্থ হওয়ায় বেসরকারী প্রদর্শন ব্যবস্থার বিকল্প কোন ব্যবস্থা এখানে গড়ে ওঠতে পারেনি। এমন একটা প্রদর্শন ব্যবস্থা তৈরী হওয়া ভীষণ জরুরী। পূর্বাঞ্চলজুড়ে যে বিচ্ছিন্নতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তা থেকে উত্তরণের জন্য পরস্পরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়াটা ভীষণ প্রয়োজন। সে পথে নিয়ে যাওয়ার বাহন চলচ্চিত্রকে সেজন্য পৌঁছতে হবে পূর্বোত্তরের দুর্গম অঞ্চলে। ভিন্ন সংস্কৃতির সঙ্গে মানুষের পরিচয় ঘটিয়ে তাঁর মননকে ক্রিয়াশীল করার প্রচেষ্টা রূপে একদিন ফিল্ম সোসাইটি গড়া হয়েছিল। দক্ষিণ ভারত ছাড়া সারাদেশে ফিল্ম সোসাইটি সে ভাবে সার্থকতা লাভ করতে পারেনি। উত্তর পূর্বাঞ্চলে তো এ ধরনের সংগঠনের অস্তিত্বই নেই। সে কারণে ব্যতিক্রমী চলচ্চিত্র যাদের মাধ্যমে কিছুটা হলেও প্রদর্শিত হতে পারতো তা হয়ে ওঠলো না। ফলে বিকল্প প্রদর্শন ব্যবস্থার উদ্ভাবন এই অঞ্চলের চলচ্চিত্রকারদেরই করতে হবে। পরিস্থিতি যে কত প্রতিকূল তা এ থেকেই বোঝা যায়। এই প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে একা পরিচালক কতদূর তাঁর লড়াই চালিয়ে যেতে পারবেন সে প্রশ্ন ইতিমধ্যেই উঠতে শুরু করেছে। বিচ্ছিন্নতাবাদমুক্ত প্রকৃত ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ এক উত্তর পূর্বাঞ্চল দেখতে যারা অভিলাষী সেই সকল শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাই পারে এই অঞ্চলের মানুষের ভাব বিনিময়ের মাধ্যমরূপে চলচ্চিত্রকে গড়ে তুলতে। চলচ্চিত্র বাজার অর্থনীতির প্রবক্তাদের স্বার্থরক্ষার হাতিয়ার হয়ে শুধুমাত্র মনোরঞ্জনের মাধ্যম হয়ে থাকার জন্য সৃষ্টি হয়নি-সেকথা উপলব্ধি করে যে সকল চলচ্চিত্রকার মানুষের কথা তাদের সৃষ্টিকর্মে প্রতিফলিত করেছেন তাদের উৎসাহ, সহানুভূতি জোগানোর মধ্যেই নিহীত রয়েছে সামাজিক দায়িত্ব প্রতিপালনের কর্তব্যটুকু।

চলচ্চিত্র চিন্তা (১)

প্রতিবছর পৃথিবী জুড়ে যত ছবি নির্মাণ হয় তার মধ্যে সর্বাধিক চলচ্চিত্র ভারতে তৈরী হয়ে থাকে বলে পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়। একথাও বিভিন্ন তথ্য পর্যালোচনা থেকে প্রকাশ পেয়েছে যে ঐ সমস্ত চলচ্চিত্রের মধ্যে মাত্র দুই শতাংশ ছবিই ভালো ছবির গোত্রভূক্ত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। বাৎসরিক ব্যাপক এই কর্মকান্ডের ক্ষুদ্র এক ভগ্নাংশের জন্যই বিদেশী দর্শকগণ উৎসুক হয়ে থাকেন। অন্যদিকে, দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য এদেশে ভালো ছবির জন্য বেশীর ভাগ মানুষের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টির প্রচেষ্টা দেখা যায় না। ভারতবর্ষই সম্ভবত এমন একমাত্র দেশ যে দেশের ভালো ছবি বিদেশীরা দেখতে আগ্রহী কিন্তু ভারতের গরিষ্ঠাংশ মানুষ দেখার সুযোগ পান না। মূলতঃ ভারতীয় কৃষ্টি,সংস্কৃতির পরিচয় বহনকারী চলচ্চিত্র সমূহ আঞ্চলিক ভাষায় নির্মিত হয়ে থাকে। সেই সমস্ত ব্যতিক্রমী ছবির সঙ্গে ভারতীয় দর্শকগণের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটার মত সর্বজন গ্রাহ্য কোন ব্যবস্থা এখন অব্দি তৈরী হয়নি, প্রধানত সে কারণে মারাঠিরা যেমন জানে না বাঙলার পরিচালক তার ছবিতে কি ভাবনার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন তেমনি মালয়ালম, তেলেগু, অসমীয়া ভাষী মানুষেরা জানতে পারে না প্রকৃত ভারতীয় ছবির অস্তিত্বের কথা। মানুষের মধ্যে ভালো ছবি দেখার তাগিদ তৈরী করার প্রচেষ্টার মধ্যেই সম্ভবত লুকিয়ে রয়েছে ব্যর্থতার কারণগুলো। যে কারণে স্বাধীনতার এত বছর পর যদিও গর্ব ভরে বলা হয়ে থকে, আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশী ছবি তৈরী হয় তথাপি গর্ব করে বলা যায় না ভারতীয় ছবির আইডেন্টিটা কি? মুনাফালোভী ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি সম্পন্ন বৃহৎ পুঁজিপতিরা হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করে যে ঘরানা তৈরী করছেন সেখানে ভারতীয়তার যথেষ্ট প্রতিফলন ঘটছে কি? ভারতীয় ছবির একটা গ্রহণযোগ্য পরিচয় এখনও যে গড়ে উঠেনি তার মূলে রয়েছে বেশী সংখ্যায় নির্মিত অভারতীয় তত্ত্বে সমৃদ্ধ সিনেমার অবশ্যম্ভাবী প্রভাব। যে কারণে ভারতীয় ছবির ক্ষেত্রে যে আগ্রহ বিদেশের দর্শদের মধ্যে তৈরী হয়েছে তা প্রধানত আঞ্চলিক ভাষার ছবিগুলো কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠেছে। এতসব সত্ত্বেও দেশের অভ্যন্তরে ভারতীয় চিন্তাধারায় প্রাণিত চলচ্চিত্র সৃষ্টি সমূহের প্রতি আগ্রহ তৈরী করার ক্ষেত্রে কোন ইতিবাচক ভূমিকা, প্রচার মাধ্যমে সরকারী স্তরে এমনকি রাজনৈতিক স্তরেও লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। এ কথা যদিও সকলেই স্বীকার করে থাকেন যে সিনেমার প্রভাব অপরিসীম

তথাপি সেই প্রভাবের ইতিবাচক দিক সমূহকে সমাজের হিতে সুস্থ ও সুন্দর মানসিকতা সম্পন্ন দর্শক **সৃষ্টির লক্ষ্যে** সদর্থক প্রচেষ্টার কথা বিশেষ শোনা যায় না। একটা সময় জাতীয় চ্যানেলের মাধ্যমে **এই ধরনের চলচ্চিত্র প্রদর্শ**নের সাহায্যে এক প্রদেশের মানুষের সঙ্গে অন্য প্রদেশের পরিচয় **ঘটাতো যা আজ বেশী কিছুদিন ধরে বন্ধ** হয়ে প্রবলভাবে সেইসব ছবিরই প্রদর্শন উর্দ্ধবাহু হয়ে শুরু করেছে যা সরকার **নিয়ন্ত্রিত চ্যানেলটি** কে বহুজাতিক সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন চ্যানেলগুলো থেকে চরিত্রগতভাবে আলাদা করতে পারছে না। পাশাপাশি সংবাদ মাধ্যম সহ প্রিন্ট মিডিয়ার সর্বত্র জুড়ে সেই সব সংখ্যাগরিষ্ঠ ছবির পোষ্টার, কাহিনী ও গল্পগাছা, প্রচার করে জনমনে আগ্রহ তৈরী করার সুক্ষ্ম প্রচেষ্টা অনেকদিন ধরেই চলছে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে সম্প্রতি সে সকল কার্যকলাপ বেশ গতি প্রাপ্ত হয়ে বিনা বাধায় ডালপালা বিস্তার করে চলেছে। এই সমস্ত কর্মকান্ডের পরিপূরক অনুঘটকের কাজটি সম্পন্ন করার দায়িত্ব দীর্ঘদিন ধরে পালন করে গেছে চলচ্চিত্রের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য সংগঠন। যাদের ওপর অস্কার নমিনেশনের জন্য ভারতীয় ছবি সুপারিশ করার দায়িত্ব বর্তায় তারা ভারতীয় ছবির প্রতিনিধিত্ব করার জন্য 'লগন' ছবিকে বেছে নিয়েছেন যদিও ইতিপূর্বে এদেশ থেকে সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটকের ছবি কখনও বিবেচিত হয়নি। ইদানিং অনেক হৈ চৈ-র পর মারাঠা ছবি 'শ্বাস'কে ওরা অস্কার নমিনেশনের জন্য পাঠিয়েছে। এই শুভবুদ্ধি নিঃসন্দেহে ভারতীয় ছবির সম্মান বৃদ্ধি করবে। কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো স্পনসরদের উদ্যোগে বলিউডের সিনেমাকে আন্তর্জাতিক হিসাবে প্রচার করার একটা সচেতন প্রচেষ্টা লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। স্পনসররা সকলে ব্যবসায়ী। এদের কাছে শিল্প,সংস্কৃতি, কৃষ্টি ইত্যাদি অর্থহীন প্রলাপমাত্র। তাঁরা চায় মুনাফা। ওদের অর্থানুকুল্যে অষ্টারডামে ভারতীয় ছবির পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। সে অনুষ্ঠানে তথাকথিত মেইনষ্ট্রীম সিনেমার কলাকুশলীগণ,নানারকম ভঙ্গিমায় নৃত্য প্রদর্শন করেন যা বিভিন্ন চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়ে থাকে। আধুনিক ভারতীয় সৃষ্টিশৈলীর এই নিদর্শন টি ভির পর্দায় প্রত্যক্ষ করে ভারতীয় নারীর মস্তক অবনত হয়ে যায়। এই সমস্ত অনুষ্ঠানের প্রচার শুধুমাত্র যে ইলেকট্রনিক মাধ্যমেই হয়ে থাকে তা নয়, বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদ মাধ্যমের সাংবাদিকরাও প্রভাবিত হয়ে থাকে। এই সমস্ত কার্যকলাপ ভারতীয় ছবি সম্পর্কে বিদেশে একটা বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি করছে। এই সত্যকে আড়াল করার জন্য প্রচার মাধ্যম সমূহ বিদেশে ভারতীয় মসলাজাতীয় ছবির খুবই জনপ্রিয়তা বলে প্রচার করে থাকে। কথাটা কতটুকু সত্য তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে কারণ বিদেশের এক শতাংশ লোকও এধরনের ছবি দেখতে আগ্রহ বোধ করে না। প্রতিষ্ঠিত তারকারা ব্যক্তিগত সম্পর্কে বিদেশ যায়। ওদের ছবির প্রদর্শনও বিদেশ ভ্রমণকে এখানকার প্রচার মাধ্যম লিখে দিলো যে হিন্দি সিনেমা এখন বিশ্বের বাজার দখল করছে সমাদর লাভ করেছে। ব্রিটিশ আমলে বিদেশে কাজকর্ম করার জন্য এখান থেকে যে সব লোকজন গিয়েছে সেইসব মানুষের সন্তানসন্ততি, নাতিগণ, যাদের ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে কোন সংযোগ নেই তাঁরা এই ধরনের মশলাজাতীয় ছবি দেখে থাকেন। সেইসব নিয়েই দেশে ওদের ধামাধরা সাংবাদিককুলের সাংঘাতিক প্রচার। প্রকৃতপক্ষে এই সমস্তই হলো স্বার্থান্বেষী মহলের প্রচার মাত্র।

আমাদের দেশের ক্ষেত্রে পরিস্থিতিটা এরকম হয়ে দাঁড়িয়েছে যা খুশি হোক কারো যেন এসব বিষয়ে কোন মাথা ব্যথা নেই। রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ রক্ষা করায় এতই ব্যতিব্যস্ত

যে সিনেমার মত একটা বিষয় নিয়ে ভাবনা চিন্তা করাটা নেহাৎই সময়ের অপচয় বলে বিবেচিত হয়। অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে একটা সাধারণ ব্রীজ তৈরী করার জন্যও সরকারী তরফে একজন ঐ বিষয়ে জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেয়া হয়ে থাকে। মজার ব্যাপার হলো ছবি তৈরী করার জন্য এ ধরনের কোন কারিগরী জ্ঞান থাকার কথা সরকারী স্তরে আবশ্যিক যোগ্যতাবলী বলে বিবেচিত হয় না। সম্ভবতঃ সিনেমা ভোটের বাজনীতিতে যথেষ্ট প্রভাব ফেলতে সক্ষম নয় বলেই ব্রীজের কাছে গুরুত্বহীন হয়ে যায়। শাসকদের দ্বারা যথার্থ মূল্যায়ন হয় না বলে শুধু যে অর্থের অপচয় হয় তাই নয় সে সঙ্গে সিনেমার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সংশয় সৃষ্টি হয়। সিনেমা কি করতে পারে, কি করতে পারে না, সমাজ কিভাবে লাভবান হতে পারে এই গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলোর বিশ্লেষণ হওয়া দরকার। প্রতিষ্ঠিত সামাজিক মূল্য বোধলালন ও ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অবক্ষয়ী প্রভাব থেকে সমাজকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে সিনেমা যে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হতে পারে একথা পৃথিবীখ্যাত সমাজবিজ্ঞানীদের চিন্তা ভাবনায় বার বার প্রতিফলিত হয়েছে। লেনিন রুশ বিপ্লবের পর সিনেমার গুরুত্বের কথা বুঝতে পেরেছিলেন এবং তাঁরই প্রেরণায় আইজেনস্টাইনের মত চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেছে যার স্পর্শে চলচ্চিত্র ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। এইসব অভিজ্ঞতা দুর্ভাগ্যজনকভাবে এদেশে সামগ্রিকভাবে প্রয়োগ হওয়ার লক্ষণ এখন অবধি দেখা যায় না। ভারতীয় সিনেমা তাই দুই ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এক ধারায় প্রকৃত ভারতীয় সংস্কৃতি ও চিন্তাধারার প্রতিফলন অন্য ধারায় চলেছে অ-ভারতীয় এক আজব চলচ্চিত্রের প্রদর্শন। দুর্ভাগ্যজনক হলেও যা সত্য তা হলো দ্বিতীয়ভুক্ত ঐ সব ছবিকে একদল বুদ্ধিজীবিও বিনোদনমূলক ছবির তকমা এঁটে চোখ বন্ধ করে রাখছেন। প্রকৃত পক্ষে সিনেমা একটা সিরিয়াস শিল্প মাধ্যম। সিনেমা খেলার জিনিস নয়। এটা শুধুমাত্র প্রমোদ উপকরণ নয়, হতে পারে না। সিনেমাকে প্রমোদ উপকরণ বলে চালানো এবং সেই সঙ্গে কুৎসিত সব কার্যকলাপ চালিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টার মধ্যে এক ধরনের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র লুকিয়ে থাকে একথা তথাকথিত বুদ্ধিজীবিদের অজানা নয়। কিন্তু একথা এরা বুঝতে চেষ্টাও করেনা যে প্রকৃত চলচ্চিত্র পরিচালক যা করে নিজের বিবেচনায় করে থাকে দর্শকের রুচির প্রতি লক্ষ্য করে নয়। প্রকৃতপক্ষে সুস্থ চলচ্চিত্রের দায়িত্ব হলো দর্শকের রুচি তৈরী করার প্রয়াস নেয়া। এক সময় ব্যবসায়িক হিন্দি ছবিগুলোতেও এ ধরনের রুচির ছাপ স্পষ্ট লক্ষ্য করা গেছে। এরকম অনেক ছবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য দো বিঘা জমিন, সাহেব বিবি গোলাম, কাগজ কি ফুল,মাদার ইন্ডিয়া ইত্যাদি ছবিগুলো ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে নির্মিত হলেও এগুলোর মধ্যে সামাজিক দায়িত্ব বোধ যথেষ্টই প্রতিফলিত হয়েছে যা ইদানীং বিশেষ লক্ষ্য করা যায় না।

সামাজিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে চলচ্চিত্র মাধ্যমটি যে যথেষ্ট সদর্থক ভূমিকা পালন করতে পারে একথা বুঝলেও তা স্বীকার করে পৃষ্ঠপোষকতা করার মত মানসিকতা প্রভাবশালী ক্ষেত্র থেকে লক্ষ্য করা যায় না বিভিন্ন বাধ্যবাধকতার জন্য। যদিও চরিত্র গঠন, মানসিক উত্তরণ ঘটানো রুচি তৈরী করার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ চলচ্চিত্রের মাধ্যমেই বিশেষভাবে প্রসারিত হতে পারে তথাপি সিনেমা যথেষ্ট গুরুত্ব এখনও পায়নি বলে এ বিষয়ে আলাদা কোন দপ্তর আজও সৃষ্টি হয়নি। সমাজ বা দেশ যদি রুচি সম্মত হয় তাহলে দেশ বা সমাজ দীর্ঘদিন টিকে থাকতে পারে। এই সহজ কথাটা এদেশের রাজনৈতিক দলসমূহের কার্যক্রমে প্রতিফলিত না হওয়াটা হতাশাজনক। দাউদ ইব্রাহিম বা ঐ জাতীয় আন্ডার ওয়ার্ল্ডের লোকজন, সন্ত্রাসবাদ সৃষ্টি করে হাজার হাজার

মানুষ মারছে। সে সমস্ত কার্যকলাপ নিয়ে হিন্দিতে একের পর এক ছবি তৈরী হচ্ছে। এসব কিসের ইংগিত বহন করে? আবার অন্যদিকে এই দাউদকে বা তার সঙ্গীদের ধরার জন্য সরকার কোটি টাকা খরচ করে চলেছে। সন্ত্রাসবাদীদের ধরার জন্য যে পরিমাণ টাকা খরচ করা হচ্ছে তার বিপরীতে সুস্থ সামাজিক অবস্থা সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট আর্থিক সংকুলান করা হয় না। সুস্থ সমাজ গঠন, সাংস্কৃতিক মনন সমৃদ্ধ মানুষের অধিক সংখ্যায় কার্যকলাপ এই বর্তমান সামাজিক পরিকাঠামোয় সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিশেষ কোন পরিকল্পনার কথা জানা যায় না। পরিণাম দাঁড়ালো নেতিবাচক কাজকে হিংসাদ্বারা প্রতিহত করার জন্য যে পরিমাণ অর্থ সময় ও শ্রম ব্যয় করা হয়ে থাকে তার সিকিভাগও ইতিবাচক সুস্থ সামাজিক ব্যবস্থা সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে ব্যয় করা হয় না। সুস্থ সামাজিক বন্ধন ও সুস্থ সাংস্কৃতিক মনের অধিকারী মানুষের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারের প্রচেষ্টা থাকা বাঞ্ছনীয় যাতে করে সমাজে দাউদের মত মানুষের সংখ্যা বাড়তে না পারে। ভালো চরিত্র, রুচি গঠন প্রক্রিয়াতে যদি খরচই না করা হয় তাহলে সমাজে মূল্যবোধ কি করে সৃষ্টি করা সম্ভব? সে কারণে সামাজিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে এক সুস্থ নেতৃত্বের অধীনে।

আমাদের সময়ের পরিস্থিতি এখন আর নেই। আমরা সিনেমার সঙ্গে পরিচিত হয়েছি অন্ধকার মাঠের মধ্যে সাদা এক টুকরো কাপড়ে প্রতিফলিত ছবির মাধ্যমে। সমস্ত রকম সিনেমাই তখন ডকুমেন্টারী বলে পরিচিত হতো। বহু ভালো ছবি আমরা এভাবে বিভিন্ন মাঠে দেখেছি। এখন সেসব হয় না। এখনকার প্রজন্ম ছবির সঙ্গে পরিচিতি লাভ করে অবৈধভাবে নির্মিত সিডি দেখে, যা এই শহরে প্রচুর পাওয়া যায় খুবই কম দামে । এভাবে ঘরের টি ভি স্ক্রীনে ছবি দেখে দেখে এই সমস্ত ছেলে মেয়েরা সিনেমা যে সেলুলয়েডে তৈরী হয় সে কথা জানতেও পারে না। এদের গরিষ্ঠাংশের কাছে সেলুলয়েড,ভিডিও ইত্যাদি ফর্মাটের বিশেষ কোন অর্থ নেই। সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির অবৈধ সিডির চাপে প্রচলিত প্রদর্শনী ব্যবস্থার নাভিশ্বাস উঠেছে। বাঁকা পথের এতই চাপ যে অধিকাংশ সিনেমা হল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এ দেশের পরবর্তী প্রজন্ম সিনেমা হলে বসে সিনেমা দেখার বিরল অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সিনেমা ক্রমেই যেন পাব্লিক প্লেস থেকে সরে গিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। যেখানে সিনেমা নিয়ে কোন আলোচনা নেই , কোন তর্ক নেই এক নিরুত্তাপ প্রদর্শন তাও প্রাত্যহিক ক্রিয়াকর্মের ফাঁকে। পাশাপাশি উন্নত দেশ সমূহের চিত্র হলো, সিনেমাকে শুধুমাত্র পাব্লিক প্লেসে রেখে দেয়া নয় সিনেমাকে শিক্ষার অঙ্গীভূত করা। ইউরোপে সিনেমা শিক্ষা বিভাগের অন্তর্গত একটা বিষয়। সে জন্য একটা দপ্তর থাকে একজন মন্ত্রী থাকেন। স্কুল কলেজ থেকে সিনেমার পাঠ শুরু হয়। অপরদিকে আমাদের সিনেমার অবস্থান কত গুরুত্বহীন। যে দেশে, সমাজে এই মাধ্যমটির গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী অনুধাবন করার কথা সেখানেই চলচ্চিত্র মাধ্যমটি সবচেয়ে বেশী গুরুত্বহীন হয়ে রয়েছে। এই গুরুত্বহীনতার পেছনে এক গরিষ্ঠাংশ ছবি নির্মাতাদের নিজেদের চলচিত্র চিন্তার দায়িত্ববোধের অভাবও যথেষ্টই গুরুত্বপূর্ণ, যা সে সকল নির্মাতাদের সৃষ্টি থেকে শিল্পীর সামাজিক দায়িত্ববোধের অভাবই প্রকট করে। রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতাহীনতা, সংবাদমাধ্যমের নেতিবাচক আলোচনা ইত্যাদি নানারকম বাধা বিপত্তির বাইরে থেকেও যে চলচ্চিত্র ভারতীয় সমাজ, দর্শন ও মননের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে শিল্প সৃষ্টি করে যাচ্ছে সে সকল মুষ্টিমেয় প্রচেষ্টাকে পৃষ্ঠপোষকতা করা প্রতিটি ভারতীয়ের অবশ্য করণীয় দায়িত্ব। সে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা অবশ্যই শিল্পীদের নিতে হবে। সে কাজ যত ছোট আকারেই হোক না কেন তার গুরুত্ব অসীম।

চলচ্চিত্র চিন্তা (২)

বিনোদন বলতে যদি চিত্তের তুষ্টিসাধন বোঝায় তাহলে বিশেষভাবে চলচ্চিত্রকে বিনোদনের প্রতিরূপ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার পেছনে নিশ্চয় বিশেষ কোন কারণ রয়েছে। সিনেমা ও বিনোদনকে সমার্থক করে বিভিন্ন মাধ্যমে সেই সূত্রের প্রচাব করে এ কথা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মনে গেঁথে দেয়া সম্ভব হয়েছে যে সিনেমা মানেই বিনোদন। এ ধরনের ভাবনা চিন্তার শরিক হয়ে পড়েছেন মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরাও। তাদের অনেকেই এক নিঃশ্বাসে বলতে চান চলচ্চিত্র ও বিনোদন সমার্থক। তাঁরা ভাবেন বিনোদনেরই প্রতিরূপ চলচ্চিত্র। বিনোদন ও চলচ্চিত্রকে সমার্থক প্রতিপন্ন করার এই পদ্ধতিও বহুদিন ধরেই ব্যবহৃত হয়ে চলেছে। প্রতিটি সিনেমারই একটা প্রভাব থাকে। সমাজের ক্ষেত্রে ইতিবাচক মনোভাবাপন্ন চলচ্চিত্র সৃষ্টিসমূহ কখনই বিনোদন রূপে চিহ্নিত হয় না। যে সকল সিনেমার নেতিবাচক প্রভাব সম্বন্ধে নির্মাতারা নিজেরাও যথেষ্ট সচেতন থাকেন তাদেরই সিনেমাকে বিনোদন বলে প্রচার করার বিশেষ প্রয়োজন ঘটে। সিনেমার এই তথাকথিত বিনোদনের চেহারাটা অনেক আগেই একদল মানবতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ মানুষের কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। সে সকল মানুষ তখন থেকেই চেষ্টা করে যাচ্ছেন সিনেমার ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যকে বেশি করে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে। সেই লক্ষ্যে যেমন তৈরী হয়েছিল ফিল্ম সোসাইটি তেমনি গড়ে তোলার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছিল এক ধরনের যৌথ উদ্যোগ। যে প্রচেষ্টার বহিঃপ্রকাশ ঘটে আইজেনস্টাইনের কাজে। হলিউডে আমন্ত্রিত হয়ে ছবি করতে গিয়ে তিনি তৈরী করেন মেক্সিকোর মানুষের সংগ্রামের ছবি। বাস্তববাদের ভিত্তির উপর চিত্রায়িত ছবিগুলোর বিরুদ্ধে লাগাতর নানা কৌশল প্রয়োগ করে সাধারণভাবে সিনেমাকে শুধুমাত্র বিনোদনের প্রতিভূরূপেই চিহ্নিত করা হয়নি এর হাত ধরে সেই সঙ্গে এসে যায় জনপ্রিয় শব্দটি। জনপ্রিয়তার মাপকাঠি নির্ণয়ের জন্য যে সকল পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়ে থাকে সে সকল তারাই নিয়ন্ত্রণ করেন যারা জনপ্রিয় ছবির স্রষ্টারূপে পরিচিত হতে পছন্দ করেন। জনপ্রিয় ছবি প্রসঙ্গে এক আলাপচারিতায় এদেশের চলচ্চিত্র সমালোচনার ক্ষেত্রে অন্যতম ব্যক্তিত্ব শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেন ''জনপ্রিয় ছবিও একটা নির্মিতি যা এক অত্যন্ত সংগঠিত ব্যবসায় শিল্পের নির্মিত। সেটা দিয়ে মানুষের মনকে, সমাজকে, সংস্কৃতিকে

ঠুলি পরানো হচ্ছে। সেটার জন্য একটা লজিক তৈরী করা হচ্ছে। যেকোনও অপরাধের জন্য একটা লজিক তৈরী করা যায়। পৃথিবীর যে কোনও ক্রিমিনাল লইয়ার পাকা নৈয়ায়িক। তারা যে কোনও ঘোর অপরাধকেও লজিকের জোরে মার্জনীয় বা পোষণীয় করে তুলতে পারেন। তেমনিভাবেই,লোকপ্রিয় সংস্কৃতি নামে একটা বাজারি পণ্য সংস্কৃতিকে শিল্পের ওপর প্রতিষ্ঠা দেওয়া হচ্ছে।'' আশার কথা হলো, হলিউড, বলিউডের পৃষ্ঠপোষকতায় বাড়বাড়ন্ত এই পণ্য সংস্কৃতি বিপণনের গড্ডালিকা প্রবাহে গা না ভাসিয়ে একদল চলচ্চিত্র কর্মী অন্য ছবি নির্মাণের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। বৃহত্তর ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর তৈরী করা প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে একটা সংঘবদ্ধ মঞ্চ আবার গড়ে এখনও উঠতে পারেনি বলে বাস্তববাদের ওপর নির্মিত বিপরীত ধারার ছবিগুলো দ্বীপের মত বিচ্ছিন্ন থেকে গেছে। মাঝে মধ্যে বিভিন্ন সিনে ক্লাবে আয়োজিত প্রদর্শনীতে বা চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হওয়া এই ছবিগুলো সাধারণ দর্শকের সামনে উন্মোচিত হয়ে প্রেক্ষাগৃহ আলোকিত করতে পারে না নানা কারণে। খুব স্বাভাবিকভাবেই চাহিদার শর্ত পূরণের সূত্র অনুযায়ী এই শূন্যস্থান পূরণ করে সিনেমাকে জনপ্রিয় বিনোদনের আকর বলে চিহ্নিত করতে তাদের বিশেষ বেগ পেতে হয় না।

বর্তমান সময় সিনেমার অবশ্যম্ভাবী প্রভাব সম্পর্কে সকল পক্ষই সচেতন। এই সচেতনতার ছাপ কোন সৃষ্টকর্মে উচ্চারিত, স্পষ্ট আবার কোন সিনেমায় অনুচ্চারিত, সুপ্ত। যারা মানুষের পক্ষে, সমাজের হিতের লক্ষ্যে সিনেমাকে ব্যবহার করতে চান তাদের সৃষ্টিকর্মে রাজনীতির স্পষ্ট প্রভাব উচ্চারিতই দেখা যায়। কাল্পনিক স্থান কাল নির্ভর নাচ , গান, মারদাঙ্গা সমৃদ্ধ তথাকথিত জনপ্রিয় ছবিতেও রাজনীতি রয়েছে তবে সুপ্তভাবে। এই সুপ্ত ভাবটা যাতে সুপ্তই থাকে সে কারণেই ওদের সিনেমাকে বিনোদনমূলক মাধ্যম বলে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস। যা প্রতিনিয়ত প্রতিফলিত হয়ে চলেছে পণ্য সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার নানারকম প্রমোর সাহায্যে। সারা বছর প্রচারের মধ্যে থাকার জন্য বিভিন্ন পণ্য প্রস্তুতকারী সংস্থার নামে আয়োজিত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানসমূহের লাইভ টেলিকাস্ট শহুরে দর্শককে দেখতে উৎসাহিত করা হয়। পাশাপাশি প্রিন্ট মিডিয়ায় সেইসব পুরস্কার বিতরণীর নেপথ্য কুটকাচালি মুখরোচকভাবে পরিবেশন করে আগ্রহ গড়ে তোলার কাজটি সূক্ষ্মভাবে সম্পন্ন করা হয়। পারস্পারিক স্বার্থরক্ষার এই খেলার একমাত্র লক্ষ্য দর্শককে সব সময় তথাকথিত জনপ্রিয় ছবির জগতে আটকে রাখা। ইলেকট্রনিক মিডিয়া, প্রিন্ট মিডিয়া, তারকাদের ফ্যাশন প্যারেড, ব্যক্তিগত সম্পর্কের মুখরোচক কাহিনী, পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সেই সব সিনেমার নৃত্য গীত পরিবেশন, এই সমস্ত প্রক্রিয়াটির মধ্যে যে সংঘবদ্ধ প্রয়াস রয়েছে তারই জোরে একথা সমাজের একটা গরিষ্ঠাংশ মানুষের মনে প্রোথিত করা সম্ভব হয়েছে যে, এটাই সিনেমা। সিনেমা মানেই বাস্তবর্জিত ঘটনার সমারোহ যা বর্তমানে অলৌকিক কার্যকলাপ প্রদর্শনীর প্রতিযোগিতায় এসে দাঁড়িয়েছে। এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছে দিতে পেরে অন্য ধারার ছবিগুলোর প্রতি মানুষের আকর্ষণকে বিপথে চালিত করার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে স্বার্থান্বেষী মহলের সূক্ষ্ম রাজনীতি। যে নীতির প্রভাবে সাধারণ দর্শক অবলীলায় বলতে পারেন, 'সিনেমা দেখতে গিয়ে ভাবতে যাব কেন'? ভাবনার জায়গাটা ভোঁতা করার জন্য সিনেমায় কামনা বাসনার আতিশয্য ঘটিয়ে আকর্ষণ বাড়াবার চেষ্টা। মানুষ যত বেশি সেসব দৃশ্যের জন্য ভীড় করবে ততই সমগ্র বিষয়টা বেশ

স্বস্তিদায়ক হয়ে দাঁড়াবে তাদের কাছে যারা এই ধরনের জনপ্রিয়তার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। অথচ, প্রকৃত জনপ্রিয় ছবির ক্ষেত্রে এ ধরনের আরোপিত কোন প্রচেষ্টার যে বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নেই সে প্রমাণও যথেষ্টই রয়েছে। বহু বছর ধরে সমান জনপ্রিয় এমন ছবিগুলো থেকে যে দুটো ছবির উল্লেখই পার্থক্যটা স্পষ্ট বুঝতে সাহায্য করে তা হলো ডিসিকার, বাইসাইকেল থীভস ও সত্যজিৎ রায়কৃত পথের পাঁচালী। পঞ্চাশ বছরেরও বেশ সময় ধরে যে চলচ্চিত্র দেশে বিদেশে, ভাষার ব্যবধান ঘুচিয়ে আজও সাধারণ মানুষের ভালো লাগা ছবিগুলোর অন্যতম হয়ে রয়েছে সেগুলো তৈরীই হয়েছে বাস্তবতার উপর ভিত্তি করে। বাস্তবতাবাদ নির্ভর ক্লাসিক পর্যায়ের এই ছবিগুলোর জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য বিশেষ কোনো প্রচেষ্টা আরোপের কথা এখন অব্দি শোনা যায়নি। প্রকৃত অর্থে ছবির জনপ্রিয়তা নির্ণয় করার জন্য প্রয়োজন অবাধ প্রদর্শন ব্যবস্থা। মানুষের কাছে পৌঁছানোর একটা নিশ্চিত প্রক্রিয়া। বর্তমান প্রচলিত পদ্ধতিতে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে যা কুক্ষিগত হয়ে রয়েছে সেই সকল সিনেমা ব্যবসায়ীদের হাতে যারা পণ্য সংস্কৃতির বিকাশে আধুনিক এই শক্তিশালী মাধ্যমটিকে ব্যবহার করতেই বেশি আগ্রহী। ফলে জনপ্রিয়তার লেবেল আঁটা ছবিগুলো যথার্থই জনপ্রিয় কি না সে সম্বন্ধে সন্দেহ থেকেই যায়।

হলিউডের সংস্কৃতি পশ্চিমী দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তের ভাষা, সংস্কৃতির বিকাশকে যেমন প্রভাবিত করতে পেরেছে আমাদের দেশে তেমনি বলিউড সংস্কৃতির দাপটে ভারতীয় সমাজ সংস্কৃতি ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়ছে। এই প্রভাব যে শুধুমাত্র আঞ্চলিক ভাষায় বলিউড অনুকরণে নির্মিত চলচ্চিত্রেই সীমাবদ্ধ রয়েছে তা নয়। আমাদের মত সর্বাথে পিছিয়ে পড়া রাজ্যেও যে এই ধরনের প্রভাব যথেষ্টই সক্রিয় তা ক্রমবর্দ্ধমান ভিডিও এলবামের সংখ্যা থেকেই বোঝা যায়। এই সর্বগ্রাসী পণ্য সংস্কৃতির বিকাশ যেভাবে প্রচলিত সব মাধ্যমের সাহায্য ঘটে চলেছে তার প্রভাব থেকে হাতে গোণা কিছু অঞ্চলেব মানুষ নিজেদের সরিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। আমাদের দেশেও কিছু পরিচালক সিস্টেমের মধ্যে থেকেই কিছু ব্যতিক্রমধর্মী ছবি তৈরী করছেন। তবে এ ধরনের সৃষ্টিকর্মের সংখ্যা এত কম যে পণ্য সংস্কৃতি তত্ত্বে সমৃদ্ধ ছবির বিপরীতে দাঁড়িয়ে সুস্থ সংস্কৃতির তত্ত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস সার্থকতা লাভ করতে পারে না। যে কারণে আঞ্চলিক ভাষায় বেশি, বেশি চলচ্চিত্র সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আঞ্চলিক সাহিত্য, শিল্পই হচ্ছে প্রকৃত ভারতীয় সংস্কৃতির আধার। সেই সংস্কৃতির বিকাশকে সফল করার জন্য যে ধরনের প্রচেষ্টা সংশ্লিষ্ট মহল থেকে প্রত্যাশিত ছিল তা ঘটেনি'বলেই তথাকথিত লোকপ্রিয়তার আড়ালে বাজারি সংস্কৃতির প্রভাব থেকে রক্ষা করা যাচ্ছে না আঞ্চলিক ভাষা ও সংস্কৃতি। প্রযুক্তির উন্নয়নে বর্তমান বিশ্ব যে একটি বৃহৎ গ্রামের চেহারা নিয়েছে পণ্য সংস্কৃতির সর্বগ্রাসী প্রভাবই তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ।

চলচ্চিত্র যে শুধুমাত্র বিনোদন শিল্প নয় এই সারকথাটা উপলব্ধি করতে পেরে নানা প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিরোধের মধ্যে থেকেও লাতিন আমেরিকান চলচ্চিত্র কর্মীরা পৃথক ও স্বতন্ত্র পন্থার সম্ভাবনা নিয়ে কাজ করে চলেছে। পরিবর্তিত সমাজের জন্য অন্য ধারা ছবির তত্ত্বে বিশ্বাসীরা গভীর আগ্রহে লক্ষ্য রাখছেন লাতিন আমেরিকানদের হাতে তৃতীয় চলচ্চিত্রের উত্থান। আমাদের দেশে এখনও চলচ্চিত্রের বিনোদনমূলক চরিত্র নিয়ে চলছে চাপান উতর।

চিন্তা ক্ষেত্রে এত ফারাক কেন ? শিল্পসৃষ্টি আর রসাস্বাদনের ক্ষেত্রে মৌল নিয়ামক হচ্ছে মানুষের মন, বোধ, চৈতন্য, রুচি। এই চৈতন্য রুচি ও বোধ তৈরী হয় শিক্ষা থেকে। যে শিক্ষা বর্তমান সময়ে প্রচলিত 'তোতাপাখী' থেকে আহরণ করা সম্ভব নয়। এখানেও রয়েছে ফাঁক। চারদিকে দ্রুত ফাঁকি যে তারই ফাঁকে পরে হাবুডুবু খাচ্ছে আত্মসর্বস্ব সব আত্মজরা।

এখন আর শুধুমাত্র তথাকথিত জনপ্রিয় চলচ্চিত্রই এক জগাখিচুড়ি সংস্কৃতির ধারক হয়ে নেই সেই সঙ্গে যোগ হয়েছে টেলিভিশন, আরো শক্তিধর মাধ্যম। যোগাসন থেকে প্রসাধন সামগ্রীর নিয়ন্ত্রণ এই মাধ্যমটির কুক্ষিগত। সামগ্রিকভাবে সিনেমা এবং টেলিভিশনে ইতিবাচক প্রভাব নিয়ে খোলামেলা আলোচনা, বিতর্ক ও পাশাপাশি মাধ্যমগুলির সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে সচেতনতা গড়ে তোলার প্রয়াস নেয়াটা খুবই প্রয়োজন। সিনেমা দেখা ও বোঝার ক্ষেত্রে ফিল্ম সোসাইটিগুলো একটা সময় পর্যন্ত দায়িত্ব পালনের সার্থক চেষ্টা করেছে। সীমাবদ্ধতার কারণেই হয়ত শহুরে মধ্যবিত্তের বাইরে সেই প্রচেষ্টার ছাপ বিশেষ লক্ষ্য করা যায় না। ফলে বৃহৎ জনগোষ্ঠী যাদের বাস শহরের সীমানার বাইরে তাদের কাছে সিনেমা অধরা এক কল্প জগতের বিষয় হয়ে থেকে গেলো। এই পরিস্থিতির পরিবর্তন তখনই সম্ভব যখন সিনেমা ও টেলিভিশন সম্বন্ধে ঐ সকল মানুষকে অভিহিত করা যাবে। মানুষ সব সময় ভালো জিনিস দেখতে চায়। সুস্থ ও উন্নত সৃষ্টি দেখার সুযোগ নেই বলে বাধ্য হয়ে বাজার চলতি সংস্কৃতিতে আবিষ্ট হয়ে থাকে। এই ভালো ও সুস্থ সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা গড়ে তোলার জন্য একটা ধারাবাহিক নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার প্রয়োজন। আমাদের দেশে প্রচলিত ব্যবস্থার মধ্যে যে সকল প্রতিষ্ঠান রয়েছে তাদেরই সাহায্যে তৈরী হতে পারে এমন এক শিক্ষাদান পদ্ধতি যা প্রয়োগ করা হবে ক্লাশরুমে। বর্তমান পরিকাঠামোয় যা শুরু হতে পারে অন্ততঃপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে। তাহলেই সিনেমা ও এর চেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম টেলিভিশনের ইতিবাচক ব্যবহার ও প্রয়োগ আরো বেশি সম্ভব হবে, যা নিঃসন্দেহে মানুষকে আরো বেশি বিজ্ঞানমনস্ক ও মানবিকবোধ সম্পন্ন হতে সাহায্য করবে।

চলচ্চিত্র চিন্তা (৩)

চলচ্চিত্র যে পূর্বতন যাবতীয় শিল্পকলার সমবায়, এই উপলব্ধির কথা প্রথম ঘোষিত হয়েছে আইজেনস্টাইনের রচনায়। চলচ্চিত্র চর্চার দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় যে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পেরেছে সেখানেও দেখা যায়, সাহিত্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা থাকলে চলচ্চিত্র বোঝার ক্ষেত্রটি সহজ হয়ে যায়। খুব সাবলিল হতে পারে সেক্ষেত্রে চলচ্চিত্র চর্চার বিষয়টি। এ বিষয়ে বিশেষ সন্দেহের অবকাশ নেই যে, বৌদ্ধিক ও ভাবগত বিকাশের ক্ষেত্রে এই মাধ্যমগুলোর অনুশীলন ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। শিল্পকলার শাখাগুলো ভীষণ ভাবে সম্পৃক্ত। পারস্পরিক সম্পর্ক যুক্ত শিল্পসৃষ্টির মাধ্যমগুলো সম্বন্ধে সম্যক ধারণা নিঃসন্দেহে চলচ্চিত্র চর্চা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে আবশ্যিক শুধুমাত্র উন্নতমানের শিল্পকলা সৃষ্টির জন্যই নয়, চলচ্চিত্রকর্মীর নিজের চিন্তা, চেতনার স্তরকে উন্নততর করার জন্যও বটে। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক হলেও এ ধরনের প্রচুর নমুনা দেখতে পাওয়া যায় যেখানে চলচ্চিত্র কর্মীদের শিল্পকলাবোধের ক্ষেত্রগুলো যথেষ্ট পরিণত হয়নি, অথচ এদেরই গরিষ্ঠাংশ পদ্মবনে মত্ত হাতির মত দাপিয়ে বেড়াচ্ছে চলচ্চিত্র চর্চার অঙ্গন। এর পেছনে কারণ খুঁজতে গিয়ে চলচ্চিত্র চর্চার প্রচলিত ক্ষেত্রগুলো অনাবশ্যকভবে বন্ধ হয়ে গিয়ে যে শূন্যতার সৃষ্টি করেছে সেদিকে ইংগিত করা হয়। পাশাপাশি রয়েছে শিল্পকলার মাধ্যমগুলোর মধ্যে পারস্পরিক আদান প্রদানহীনতা। পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদানের জায়গাটা তৈরী হতে পারেনি বলে পরস্পর নিজেরাও সমৃদ্ধ হতে পারে না। নিজস্ব ঘেরাটোপে একেকটি দ্বীপের বাসিন্দা হয়ে থাকে। যে কারণে চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে যে সমস্যা গভীরতা লাভ করেছে তা অন্য কলামাধ্যমের কর্মীদের উদ্বিগ্ন করে না। বিষয়টিকে শুধুমাত্র চলচ্চিত্র কর্মী ও সে সম্পর্কে যারা ভাবনাচিন্তা করেন তাদের সংকট বলে এড়িয়ে যান। বস্তুতপক্ষে, বহু সামাজিক সমস্যার জড় যেখানে লুকিয়ে রয়েছে সে জায়গাটা সম্বন্ধে উদাসীন থাকার ফলে চলচ্চিত্র নামে যে সকল পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে তা সামগ্রিকভাবে যে একটা সাংস্কৃতিক সংকটের সৃষ্টি করতে উদ্যত হয়েছে সে বিষয়টা গুরুত্বসহ বিচার বিশ্লেষণ করা হয় না।

অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়ায় ভোগবাদী দর্শনে মজে থাকা বর্তমান সময়ের চলচ্চিত্র নামক

মাধ্যমটিকে সমাজের ভেতর একটা পরিবর্তনকামী চেতনা সৃষ্টির কাজে ব্যবহার করা কতটুকু সম্ভব এই প্রশ্ন তোলা শুরু হয়েছে। এই ধরনের ইতিবাচক সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখেই একদিন ফিল্ম সোসাইটির জন্ম দিতে এগিয়ে এসেছিলেন মানবতার মন্ত্রে দীক্ষিত একদল অগ্রণী মহৎ শিল্পস্রষ্টা। ১৯২৫ সালে যখন লন্ডনে, বিশ্বের প্রথম ফিল্ম সোসাইটি তৈরী হয় সে সময় যাঁরা উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে সদস্য হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নামগুলি হলো,জর্জ বার্ণাড শ, জে বি এস হলডেন, জন মেইনার্ড ক্লীনস, ক্লাইভ বেল, রজার ফ্রাই, লেনার্ড উলফদের। সে সময় যারা চলচ্চিত্র নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে মাত্র দু'তিনজন সোসাইটির সদস্য হয়েছিলেন। সিনেমাকে সুস্থ চেতনাসমৃদ্ধ শিল্পকলা চর্চার ক্ষেত্ররূপে প্রতিষ্ঠা করার চিন্তা ভাবনা থেকেই ফিল্ম সোসাইটি গড়ে ওঠার প্রেক্ষাপট তৈরী হয়। যে কথা সেই সময়ের চলচ্চিত্র কর্মীদের থেকে শিল্পকলার ভিন্ন মাধ্যমের দিকপালদেরই বেশি ভাবিয়েছিল। এ ছবি শুধুমাত্র লন্ডন ফিল্ম সোসাইটির নয়, শিল্পকলা চর্চার সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন মাধ্যমের দিকপাল স্রষ্টাদের যোগদানে ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের গোড়ার পত্তন ঘটেছিল প্রায় সব দেশে। আমাদের দেশেও এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

ভারতে প্রথম ফিল্ম সোসাইটি গঠিত হয় মুম্বাইতে ১৯৩৭ সনের ২২ শে এপ্রিল। 'এমেচার সিনে সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া' নামের ঐ সংগঠনটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ইলেষ্ট্রাটেড উইকলি অফ ইন্ডিয়ার সম্পাদক ষ্টেনলি জেপসন ও অন্যান্য বিশিষ্ট লেখক। ১৯৫৬ তে গড়ে ওঠে 'দিল্লী ফিল্ম সোসাইটি'। প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ছিলেন কৃষ্ণ কৃপালনি, গোপালন, চঞ্চল সরকার, বিজয়া মূলে। উল্লেখযোগ্য সদস্য ছিলেন ইন্দিরা গান্ধী, অরুণা অসফ আলি, ইন্দ্র কুমার গুজরাল। সমাজতান্ত্রিক চেতনা যা ঐ সময়ের উচ্চ মেধা সম্পন্ন স্রষ্টাদের মননকে স্পর্শ করতে পেরেছিল নিঃসন্দেহে তা ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনে যোগদানের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিল। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার তৈরী ছবিগুলো মূলতঃ সাধারণ মানুষের শোষণ ও দারিদ্রের বিরুদ্ধে লড়াই করে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সে সমস্যাগুলো থেকে উত্তরণের পথনির্দেশ করতে। সে ধরনের ছবির প্রদর্শন ব্যবস্থা হলিউডের প্রচলিত ব্যবস্থায় করা সম্ভব ছিল না বলে একটা বিকল্প প্রদর্শন ব্যবস্থা গড়ারও প্রয়োজনীয়তা সে সময় বোঝা গিয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার মানুষের জীবন সংগ্রামের কথা তাদের সৃষ্ট চলচ্চিত্রের মাধ্যমে ফিল্ম সোসাইটির সাহায্যে পৃথিবীর প্রত্যন্ত স্থানেও পৌছুতে পেরেছে। সাধারণতঃ দূতাবাসগুলোর মাধ্যমে বিনে পয়সায় ছবিগুলো এক সোসাইটি থেকে আরেক সোসাইটি ঘুরে ঘুরে প্রদর্শিত হতো। পরবর্তী সময়ে হলিউড প্রভাবিত চলচ্চিত্র ও ফিল্ম সোসাইটির ব্যবস্থায় ঢুকে পড়েছিল, যা ফিল্ম সোসাইটির সদস্যদের তুলনামূলক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যথেষ্টই সহায়ক হয়েছিল। ছোট ছোট স্কুল ঘরে আয়োজিত ফিল্ম সোসাইটির ঐ সব প্রদর্শনীতে শহুরে মধ্যবিত্ত অংশের মানুষই বেশি অংশ গ্রহণ করতেন। আমাদের দেশেও ফিল্ম সোসাইটি মধ্যবিত্ত সমাজে বিশেষ স্থান করে নিয়েছিল। চলচ্চিত্র চর্চা সমাজের একটা বিশেষ অংশে সীমিতভাবে হলেও যথেষ্টই প্রাণবন্ত ছিল। প্রচুর কাগজ বেরিয়েছে সে সময়, নানা রকম লেখায় সমৃদ্ধ থাকতো সে সব চলচ্চিত্র চর্চার বই ম্যাগাজিনগুলো। পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রভাবে ক্রমে ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন স্থবিরত্ব প্রাপ্ত হয় যা ক্রমশঃ বিলুপ্তির পর্যায়ে এসে গেছে। শহরাঞ্চলে গড়ে ওঠা যেসব ফিল্ম সোসাইটিগুলো

লক্ষ্যচ্যুত হয়ে শুধুমাত্র চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ও সে সংক্রান্ত আড্ডায় নিজেদের ব্যস্ত রেখেছে সেই সব সোসাইটি বিনামূল্যে ছবি পাওয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে নিজেদের কর্তব্যও শেষ হয়েছে মনে করতে শুরু করেন। ফিল্ম সোসাইটি যে অঞ্চলে প্রকৃতই মানুষের মধ্যে চলচ্চিত্রবোধ জাগিয়ে তুলতে পেরেছে সেখানেই চলচ্চিত্র মানুষকে নব অভিজ্ঞতার মুখোমুখি করে নতুন চেতনার জন্ম দিতে পেরেছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এ ধরনের সার্থক সংগঠনের সংখ্যা খুবই অল্প। বেশিরভাগ ফিল্ম সোসাইটিই অন্ধগলিতে পথ হারিয়েছে। মানুষের কাছে পৌঁছানোর কথা বলে যে ফিল্ম সোসাইটির সৃষ্টি হয়েছিল বিভিন্ন জায়গায় বস্তুতপক্ষে সেই সব সদস্যবৃন্দের বিশেষ করে পরবর্তী সময়ে আদর্শচ্যুত হয়ে ফিল্ম প্রদর্শনকে একমাত্র ধ্যানজ্ঞান করে ফিল্ম সোসাইটিকে সাধারণ ক্লাব পর্যায়ভুক্ত করে ফেলার মানসিকতা নিশ্চিতরূপে বিশেষভাবে দায়ী। যদিও, ফিল্ম সোসাইটির কার্যকলাপ প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার পেছনে সামগ্রিকভাবে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার পতনকেই দায়ী করা হয়। রাশিয়ার উদ্যোগে বিনে পয়সায় ছবি পাওয়ার যে বন্দোবস্ত চালু ছিল তা পরবর্তী সময়ে হলিউডের কুক্ষিগত হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। দূতাবাসগুলো ক্রমে বিনে পয়সায় ছবি দেয়া বন্ধ করে দেয় যা কি না ফিল্ম সোসাইটির মাধ্যমে চলচ্চিত্র চর্চা বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রধান কারণ বলে ক্লাব পর্যায়ে নিয়ে আসা ফিল্ম সোসাইটির সংগঠকেরা মনে করেন। কিন্তু যে অল্প কয়েকটি সংগঠন প্রকৃতই চলচ্চিত্রচর্চা ক্ষেত্রের মান দিয়ে ফিল্ম সোসাইটির কাজকে এগিয়ে নিতে চেয়েছেন তাঁদের কাজ বিদেশী দূতাবাস থেকে বিনে পয়সায় ছবির প্রিন্ট আসা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় থেমে থাকেনি। আমাদের দেশে এমন গৌরব করার মত সংগঠন নিনাসম। কর্ণাটকের ঐ সংগঠনটি ষাটের দশকেই 'পথের পাঁচালি''বাই সাইকেল থিভস''ব্যাটলশিপ পটেমকিন' এর মত ক্লাসিকগুলো কর্ণাটকের খুব ভেতরের গ্রামে প্রদর্শন করে এবং ছবি সম্পর্কে মানুষের মতামত গ্রহণ করে। নিনাসম এখন ভারতীয় ছবি বিশেষ করে ডকুমেন্টারী বিভিন্ন প্রদেশ থেকে বাছাই করে এনে নিয়মিত প্রদর্শনী করেন। বিভিন্ন পেশার, বিভিন্ন বয়সের, সামাজিক অবস্থানের মানুষ একসঙ্গে নানা ধরনের যেমন, জীবনী, রাজনৈতিক, মহিলা সংক্রান্ত, পরিবেশ বিষয়ক, সংগ্রাম , এমনকি অরণ্য বিষয় নির্ভর ডকুমেন্টারী ছবি দেখেন তেমনি আলোচনায় অংশগ্রহণও করেন। প্রকৃতপক্ষে প্রদর্শনীর পর দর্শকদের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে উৎসাহিত করা হয়। প্রকৃতই চলচ্চিত্র নিয়ে চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রটিকে লালন পালন করা হয় সেখানে। এই কাজটিই স্তিমিত হয়ে যাওয়া ফিল্ম সোসাইটিগুলো অন্ততঃপক্ষে আঞ্চলিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে চালিয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে একদিকে যেমন, আঞ্চলিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনের একটা স্বতন্ত্র পরিকাঠামো গড়ে উঠবে, পাশাপাশি চলচ্চিত্র নিয়ে দর্শকদের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াসহ চলচ্চিত্র বিষয়ক আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ এই মাধ্যটিকে তৃণমূল স্তরে প্রকৃত অর্থে জনপ্রিয় হতে সাহায্য করবে। এই ধরনের প্রদর্শনীর আয়োজন অবশ্যই শহর থেকে দূরে করতে হবে। কারণ, শহর থেকে যারা দূরে থাকেন তাদের কাছে পৌঁছানোর বিকল্প ব্যবস্থা এখনও গড়ে ওঠেনি। এ কাজে ফিল্ম সোসাইটি সহ অন্যান্য সামাজিক দায়িত্ব পালনে রত সংগঠনের সাহায্যে চলচ্চিত্রকে অধিকাংশ দর্শকের বাসস্থানের কাছাকাছি নিয়ে যেতে হবে যাদের গরিষ্ঠাংশই বাস করেন শহরের সুযোগ সুবিধার আওতার বাইরে। প্রচলিত প্রদর্শন ব্যবস্থায় যে সব ছবি অধিকাংশ ভারতীয় দর্শক দেখতে পান না সেক্ষেত্রে এই ধরনের প্রদর্শন

ব্যবস্থা একটা সংযোগ তৈরী করতে সাহায্য করবে, যা থেকে চলচ্চিত্র নির্মাতা যেমন অভিজ্ঞতা লাভ করবেন তেমনি দর্শকও সমৃদ্ধ হবেন। পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সাহায্যও এই ধরনের প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে নেয়া যেতে পারে। তবে উদ্যোগ নিতে হবে চলচ্চিত্র আন্দোলনেব কথা বলে যারা ফিল্ম সোসাইটি গড়েছেন তাঁদেরই।

এই ধরনের চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ও আলোচনা তা যে ফর্মাটেই হোক না কেন উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোয় হওয়া ভীষণ প্রয়োজন। উত্তর পূর্বাঞ্চলে বাস করেও এক অঞ্চলের মানুষ অন্য অঞ্চল সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানে না। এখনও কারো মনে হয় খাসীয়ারা আন্দামানের বাসিন্দা আবার এই অঞ্চলেরই কিছু মানুয মনে করেন উন্নত ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে তাদের চিরায়ত সংস্কৃতির অবলুপ্তি ঘটছে। এই যে ভিন্ন ধারার চোরাস্রোত সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চল জুড়ে বইছে সেই ভ্রম দূর হতে পারে পারস্পরিক সংস্কৃতিব সংস্পর্শে এসে। সে কাজটি চলচ্চিত্রের পক্ষেই পালন করা সম্ভব এ কারণে যে, যাবতীয় শিল্পকলার সমবায় এই মাধ্যমটি একই সঙ্গে বহন করে সাহিত্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, সংগীত, নৃত্য, ভাষা, পোশাক পরিচ্ছদ থেকে আচার আচরণ, সবকিছু। প্রদর্শনের জন্যও বিশেষ ব্যয় হওয়ার কথা নয় এজন্য যে বর্তমানে ভিসিডি, ক্যাসেট ইত্যাদির মাধ্যমে খুব দ্রুত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পৌঁছে যেতে পারে এই অঞ্চলের সৃষ্টিসমূহ। প্রয়োজন একটু উদ্যম। গৌহাটি সিনে ক্লাব গৌহাটি শহরে তাদের নিয়মিত প্রদর্শনীর বাইরে শহর থেকে দূরে, মনাকুছি, শুয়ালকুছি গ্রামে চলচ্চিত্রকে নিয়ে গেছে। প্রক্রিয়াটা সেখানে শুরু হয়ে গেছে। এই ধরনের বিকল্প চলচ্চিত্র প্রদর্শনই চলচ্চিত্র আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। চলচ্চিত্র প্রদর্শনের সব প্রথাগত দরজা যেখানে বন্ধ সেখানে বিকল্প চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা গড়ে ওঠাই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া রূপে বিবেচিত হওয়ার কথা বিশেষ করে যখন একটা সংবেদনশীল সরকার, এই ধরনের কাজে সহায়তা করতে সদাই প্রস্তুত। তাছাড়া ত্রিপুরার মানুষ অন্তঃতপক্ষে উত্তর পূর্বাঞ্চলে বসবাসকারী অন্য প্রদেশের তুলনায় যথেষ্ট সচেতন শুনতে পাই। একথাও জানি যে,ত্রিপুরায় জনশিক্ষার মত একটা শিক্ষা আন্দোলন হয়েছে যে আন্দোলনের প্রভাব এখানকার সমাজ থেকে এখনও শেষ হয়ে যায়নি। তথাপি পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুকূল হওয়া সত্বেও ফিল্ম সোসাইটিগুলো তাদের কর্মপরিধি যে শহরেই সীমিত রেখেছিল তাদের কার্যবিবরণী থেকেই তা জানা যায়। ফলে, চলচ্চিত্র প্রকৃত অর্থে মানুষের কাছে পৌছতে পারেনি এখনও। এমনকি শহরাঞ্চলেও চলচ্চিত্র চর্চার ক্ষেত্রে তাদের কার্যকলাপ বিশেষ রেখাপাত করতে পেরেছে বলে মনে হয় না। অথচ, করিমগঞ্জ ফিল্ম সোসাইটি, নানারকম প্রতিকূলতার মধ্যেও নিয়মিত চলচ্চিত্র চর্চা চালিয়ে যাচ্ছেন। একটি উন্নতমানের চলচ্চিত্র বিষয়ক পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ করে চলেছেন। করিমগঞ্জ থেকে প্রকাশিত চলচ্চিত্র বিষয়ক আলোচনা পাঠককে চলচ্চিত্রের বর্তমান গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে অবহিত হতে সাহায্য করে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে গৌহাটি সিনে ক্লাবের পাশে করিমগঞ্জের ফিল্ম সোসাইটিই একমাত্র চলচ্চিত্র সংগঠন যারা নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে যথেষ্টই সচেতন। এর পাশে ত্রিপুরার ছবিটা কত নিষ্প্রভ। করিমগঞ্জের খুব নিকটে নয় শুধু, ত্রিপুরার সঙ্গে বর্হিরাজ্যের যোগাযোগের প্রধান কেন্দ্র হচ্ছে ধর্মনগর। শুধু ভৌগোলিক নৈকট্য নয় ভাষা সংস্কৃতি এক হওয়া সত্ত্বেও করিমগঞ্জের ফিল্ম সোসাইটির বিন্দুমাত্র প্রভাব ধর্মনগরে পরেনি। অথচ, ধর্মনগর সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে মোটেই পিছিয়ে পড়া স্থান নয়।

সাংস্কৃতিক চর্চার পৃষ্ঠপোষাকতায় উদার মানুষ যারা দিনের পর দিন শিল্পকলার বিভিন্ন মাধ্যমকে উৎসাহিত করেছেন সেই চেতনা সমৃদ্ধ মানুষের কাছে চলচ্চিত্র ও সে বিষয়ে চর্চা কেন গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে এটা নিশ্চয় ভাবনার বিষয়।

চলচ্চিত্রের সঙ্গে কবিতা ও শিল্পকলার একটা গভীর সম্পর্ক আছে। বিশ্ববন্দিত চলচ্চিত্র নির্মাতা ও পরিচালকদের বিভিন্ন লেখায় চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে কবিতার কথা, রহস্যের কথা, প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁরা বিশ্বাস করেন, সার্থক চলচ্চিত্রের প্রতিটি সিকুয়েন্সই একেকটি ইমেজ। সেই ইমেজ একের পর এক গেঁথেই সৃষ্টি হয় কবিতা। আঁদ্রে তারকাভস্কি লিখেছেন-কবিরা অসাধারণ, কারণ তাঁরা মানুষের জীবন এবং মানুষের প্রতি সংবেদনশীল। চলচ্চিত্র এবং কবিতা উভয়ই কল্পনাতীতভাবে বোধকে জাগিয়ে তুলতে পারে। কবিতার কাছে যেমন চলচ্চিত্রকারকে যেতে হয় তেমনি চলচ্চিত্রের কাছে কবিকে যেতে হয়, সৃষ্টির কাজে উদ্দীপিত হতে। সার্থক চলচ্চিত্রে একজন কবির দেখার, শোনার, ভাববার, কল্পনা করার মত বহু দৃশ্য,কথা থাকে। চিত্রায়িত জীবনের ব্যাপ্তি, ব্যঞ্জনা, রহস্য, সত্য আর সৌন্দর্যের স্বরূপ আস্বাদনের, ছিটেফোঁটা সুযোগও যখন বন্ধ হয়ে যায় তখন শিল্পকলার ভিন্ন মাধ্যমেও তার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। চলচ্চিত্রচর্চা তাই শুধুমাত্র বিশেষ কোন গোষ্ঠীর দায়িত্ব নয়, সঠিকভাবে বলতে গেলে বর্তমান সময়ে বিষয়টি সামাজিক প্রক্রিয়ার গুরুত্ব দাবী করে। যেখানে সমাজের সব অংশের মানুষের অংশগ্রহণ ভীষণভাবে প্রয়োজন। তবে, এই বিষয়ে শিল্পকর্মে নিয়োজিত সমাজের সংবেদনশীল সৃষ্টিকর্মীদেরই এগিয়ে আসতে হবে যাদের অগ্রভাগে থাকবেন কবি। কবি ছাড়া জয় বৃথা।

চলচ্চিত্র চিন্তা (৪)

গল্প যেখানে থেমে যায়,সেখানেই কবিতার সূচনা। আর কবিতার যেখানে শেষ সেই জায়গাটা থেকে চলচ্চিত্রের সূত্রপাত। কবিতা ও চলচ্চিত্রের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এরকম চিন্তা ভাবনার কথাই বেরিয়ে এসেছে। পৃথিবীর তাবৎ মহৎ চলচ্চিত্র সৃষ্টির সপক্ষে আরো যা বলা হয় তা হলো-লুই বুনুয়েল এবং আরো কয়েকজন চিত্র পরিচালক অনেকদিন আগেই সেই কথাটা ধরতে পেরেছিলেন। তাঁদের তৈরি ছবিগুলোর কাছে বার বার তাই ফিরে আসতে হয়, কবিতা কি করে লিখতে হবে সেটা শিখে নেওয়ার জন্য। কবিতার সঙ্গে চলচ্চিত্রের এই অনুষঙ্গের কথা উপলব্ধির। যে উপলব্ধি সৃজন ক্রিয়ায় রত শিল্পীর মননকে প্লাবিত করে, সৃষ্টি করে এমন সব পঙক্তি যা অনুভবের জগৎকে নব পরশে জাগিয়ে তোলে। কবিতায় তাঁর ভাবনাকে বাঙ্ময় করে কবি প্রকাশ করেন—

চলচ্চিত্র চিত্রায়িত জীবন
জীবনের অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ
যেখানে ধবনি দৃশ্য আর নীরবতার মাঝে
বস্তু জগৎ মনোজগতে রূপান্তরিত হয় .... তিনি আরো বিশ্বাস করেন, সার্থক চলচ্চিত্রের প্রতিটি সিকুয়েন্সই একটা ইমেজ। বিশিষ্ট কবি, চিত্র সমালোচক নীলমণি ফুকন একথার সমর্থনে নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন এভাবে —একটার পেছনে আরেকটা ইমেজ গেঁথে আমি বেশ কিছু ভালো কবিতা লিখেছি। আমার কবিতায় ইমেজের প্রাধান্য। আমার কিছু কবিতার চিত্রকল্প অজ্ঞাতসারেই চলচ্চিত্র থেকে এসেছে। একটা উদাহরণ দিই। 'ডায়েরী অব এ ম্যাড ম্যান' ছবিতে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় কাচের ঘরে একজন মানুষকে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। উম্মাদ, নগ্ন সেই মানুষকে আমি বেশ কয়েকবার স্বপ্নে দেখেছি। আমার কবিতা সংগ্রহের চল্লিশ নম্বর কবিতাটিতে রয়েছে সে দৃশ্যের প্রভাব। আমি মনে করি, আমাদের কবিদের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রসমূহ দেখতে হবে।

একটা সার্থক চলচ্চিত্রে একজন কবির, দেখার, শোনার, ভাববার, কল্পনা করার মত বহু দৃশ্য, কথা থাকে। সঙ্গীত তো থাকেই। চিত্রায়িত জীবনের কি ব্যপ্তি, কি ব্যঞ্জনা—রহস্য আর কি গভীর সৌন্দর্য। কল্পনা আর স্বপ্নের ভাষার কাছে কবিতা আর চলচ্চিত্রের নির্ভরতা এই দুই সৃষ্টিকর্মের মধ্যে যে সাযুজ্য সৃষ্টি হওয়ার প্রয়াস তৈরী করে সেখানেই পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের প্রধান কার্যকারণ নিহিত রয়েছে। পাঠক, কবিতা কেন?

কবিতা এ পৃথিবীকে বাসযোগ্য ভূমি করে তোলে।''

কবিতা পাঠ জাগতিক ভোগ বিলাসের কোন গোপন মন্ত্র শিখিয়ে দেয় না, তথাপি, জীবনের কোন না কোন সময় মানুষ একবার হলেও কবিতা পাঠ করেন। কবিতা পাঠে কেউ বাধ্য নন বা বলা যায় কাউকে বাধ্য করে কবিতা পাঠ করানো যায় না। সৃষ্টির স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে পাঠকের অনুভূতির জগতকে আন্দোলিত করে বলেই কবিতার প্রতি পাঠকের অনুরাগ। শব্দের মাধ্যমে যে রূপকল্প সৃষ্টি হয়ে কবিতা তৈরী হয় সেখানেই পাঠক প্রতি মুহূর্তে আবিষ্কার করেন তাঁর প্রিয় এই জগতের নানা রূপ। কবিতার কাছে মানুষ তাই ফিরে ফিরে আসে। বহু যুগ ধরে। সেই কবিতায় যখন যথোপযুক্তভাবে কবি তার মনোজগতের উপলব্ধির কথা প্রকাশ করতে পারছেন না বলে ভাবেন তখনই তিনি আরো শক্তিশালি কোন শিল্প মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টিকর্ম চালিয়ে নেয়ার প্রয়াস করেন। চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাসে দেখা গেছে বহু প্রথিতযশা কবি আরো প্রভাবময় শিল্প সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন সেলুলয়েডে। কবিতা পেরিয়ে তাঁরা পৌছে গেছেন নিজেদের শিল্পকর্মের এমন এক শৃঙ্গে যেখানে কবির ভাষা রূপ পেয়েছে চিত্রায়িত জীবনে। জীবনবোধের এমন চিত্রায়নের পেছনে কবি শক্তির অনুপ্রেরণাই যে মূল চালিকা শক্তির ভূমিকা পালন করেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। কবিতা যেমন শেখানো যায় না তেমনি সিনেমাটোগ্রাফির শিল্পও শেখানো যায় না। সিনেমাটোগ্রাফির মাধ্যমে শিল্প সৃষ্টি করার জন্য প্রয়োজন ভীষণভাবে এক অনুভূতিপ্রবণ শিল্পী মনের যা, শুধুমাত্র সিনেমাটোগ্রাফি শিখে লাভ করা যায় না। এ প্রসঙ্গে প্রবাদ প্রতিম সিনেমাটোগ্রাফার সুব্রত মিত্র'র উপলব্ধি হলো- ''ফটোগ্রাফির ভালোমন্দ এখন প্রধানত নির্ভর করে ক্যামেরাম্যানের নিজের ইস্থেটিক সেন্স এর উপর, যদিও ভালো যন্ত্রপাতি ও বেসিক টেকনিকগুলো খুবই প্রয়োজনীয়।'' ভালো যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও বেসিক টেকনিকগুলো সিনেমাটোগ্রাফি ক্লাশে শেখা যায় কিন্তু ইস্থেটিক সেন্সটা বোধ হয় শেখা যায় না। যেমন কবিতায় শব্দর পর শব্দ গেঁথে ইমেজ সৃষ্টি করাও শেখানো যায় না। লেখালেখিটা লিখেই শিখতে হয়। ইস্থেটিক সেন্সটাও চর্চার মাধ্যমে শাণিত করে নিতে হয়। শাণ দেওয়ার প্রথম পাঠ পাওয়া যায় সম্ভবত কবিতা থেকেই। কবিতা আর চলচ্চিত্রের এই নিবিড় সম্পর্কই চলচ্চিত্রের কবিত্বময়তাকে মহিমান্বিত করেছে।

চলচ্চিত্রের কাছে কবিকে সৃষ্টিশীল কজের প্রেরণা পাওয়ার জন্য আসার আহ্বান জানানোর মধ্যে নিহিত রয়েছে শিল্প সৃষ্টি সমূহের পারস্পরিক আদান প্রদানের দায়িত্ববোধ। চলচ্চিত্রের প্রভাবময়তার ধারে কাছেও পৌছুতে পারছে না প্রচলিত সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমগুলো। আধুনিক প্রযুক্তির এই মাধ্যমটি প্রতিনিয়ত মানুষকে ঋদ্ধ করেছে

নানাভাবে নানারূপে। চলচ্চিত্র এমন সব অভিজ্ঞতার মুখোমুখি দাঁড় করায় যা উপলব্ধির জগৎকে আন্দোলিত করে, সৃষ্টিকর্মে উৎসাহ জোগায়। চলচ্চিত্রের এই সংগোপন অথচ শক্তিশালী বিস্তার অমোঘভাবে একজন কবিকে প্রভাবিত হতে সাহায্য করে যা, কবির সৃষ্টিকর্মে ইতিবাচক প্রভাবই শুধু ফেলে না. তাঁকে নব চিত্রকল্প রচনায় উদ্বুদ্ধ করে। প্রেরণা জোগায়। চলচ্চিত্রের এই বৈশিষ্ট্যই শিল্পকর্মটিকে অন্য শিল্পকলা সৃষ্টির মাধ্যমগুলো থেকে স্বতন্ত্রতা দিয়েছে। শিল্পকলা সৃষ্টির প্রচলিত সব মাধ্যমগুলোর নির্যাস নিয়ে সৃষ্ট সার্থক চলচ্চিত্র তাই সম্ভ্রম আদায় করে নিতে সক্ষম। সার্থক চলচ্চিত্রের প্রসার তাই প্রয়োজন। প্রয়োজনে দায়িত্ব পালনের জন্য এই মুহূর্তে কবির প্রতি নির্ভরতা ছাড়া সম্ভবতঃ আর বিশেষ কোন বিকল্প নেই। কবিতা চর্চাই একমাত্র জায়গা যেখানে কবি হওয়ার উন্মাদনা নিয়ে স্বতঃস্ফুর্তভাবে তরুণ প্রজন্মের বিরামহীন আনাগোনা এখনও প্রবহমান। সৃষ্টি কর্মের উন্মাদনায় মজে থাকা এই সব তরুণদের মধ্যে নিশ্চিতই কেউ কেউ কবি শিরোপা লাভ করে কবিতার মধ্যে নিজ প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হবে। আবার কেউ হয়ত চলচ্চিত্র সৃষ্টিকর্মে নিয়োজিত হয়ে এমন জীবন চিত্রায়নে সক্ষম হবে যা শিল্পকলা ক্ষেত্রে এক দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। এই সম্ভাবনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অগ্রণী সাহিত্যসেবীদের বিশেষ করে কবিদের সহযোগিতা অত্যন্ত প্রয়োজন। অন্ততপক্ষে চলচ্চিত্র অধ্যয়নের ক্ষেত্রে। চলচ্চিত্র অধ্যয়নই তরুণ কবিদের সৃষ্টিকর্মের এমন একউদ্ভাসিত জগতে প্রবেশের ছাড়পত্র পাইয়ে দেবে যা তাঁর কবি প্রতিভার বিকাশকে আরো অর্থবহ হতে সাহায্য করবে। চলচ্চিত্র অধ্যয়নের প্রথম শর্তই হচ্ছে চলচ্চিত্র প্রদর্শন। বিভিন্ন কবিতা পাঠের আসরে কবিতা চর্চা করেন এমন সুস্থবোধসম্পন্ন মানুষের আগ্রহের একটা প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। সৃষ্টিকর্মের ক্ষেত্রে নিয়োজিত ক্রমবর্দ্ধমান কবি শিরোপা অভিলাসীদের আরও পরিশিলিত ও শাণিত কাব্যচর্চার জন্য জীবনে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার রস আস্বাদনের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। চলচ্চিত্রায়িত জীবন থেকে যা আহরিত হয়ে কবিতায় প্রতিফলিত হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে সক্ষম। এই সম্ভাবনা বাস্তবায়নের জন্য সার্থক চলচ্চিত্র সৃষ্টি সমূহের প্রদর্শন বিশেষ করে কাব্যচর্চায় নিয়োজিতদের কিছুটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে বলে বিশ্বাস হয়। প্রচলিত চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থাগুলো যখন একেবারেই বন্ধ হয়ে যায় তখন বিকল্প পদ্ধতি তৈরী করাটা সামাজিক কারণেই জরুরী হয়ে পড়ে। বর্তমান এই সময়ে আত্মসর্বস্ব ভোগবাদে বিশ্বাসী মানুষের ভীড়ে এমন কিছু ব্যতিক্রমী চিন্তাভাবনায় লালিত ও কাব্যচর্চায়রত মানুষ রয়েছে যাদের অনুপস্থিতি হয়ত সমাজের ভারসাম্যই নষ্ট করে দিতে পারে। সেই কবিদের আরো বেশি চর্চার মধ্যে থাকার জন্য ও আরো বেশি পৃথিবীর সাহিত্য , শিল্প সংগীত মোট কথা সৃষ্টিকর্মের প্রায় সব কয়টি শাখার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য চলচ্চিত্রের কাছেই যেতে হয়। সার্বিকভাবে কাব্য সাধনায় আরো গভীরভাবে নিয়োজিত থেকে উন্নত কবিতা সৃষ্টির প্রেরণা লাভের দিশায় চলচ্চিত্র অধ্যয়নের পরিমন্ডল গড়ে তুলতে হবে। কবিদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই ধরনের ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারবে বলে বিশ্বাস না করার কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ নেই। উত্তর পূর্বাঞ্চলের মত বিচ্ছিন্ন একটা অঞ্চলে এই ধরনের প্রচেষ্টাই বিশেষ কার্যকর হতে পারে। এই অঞ্চলের

চলচ্চিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমেই যা শুরু হওয়া দরকার। উত্তর পূর্বাঞ্চলের চলচ্চিত্রে রয়েছে জীবন এবং প্রকৃতির এক অপূর্ব মেলবন্ধন। রয়েছে নানা ভাষা, নানা বর্ণের মানুষের নিজস্ব পদ্ধতিতে জীবনকে স্পর্শ করবার,অনুভব করার এক সার্থক প্রচেষ্টা। যেখানে কবিতার ভাষা মূর্ত হয়ে ওঠে। একই অঞ্চলের বসবাসকারীদের মধ্যে যে কৃত্রিম বিভাজন চূড়ান্ত ভবিতব্যর রূপ গ্রহণ করে রয়েছে সে রেখা মুছে ফেলার জন্য চলচ্চিত্রই হতে পারে আদর্শ অভিব্যক্তি।

আঞ্চলিক কবিতা বিদেশী ভাষায় অনুদিত হয়ে এই অঞ্চলের শিক্ষিত একটা অংশের মানুষের কাছে হয়ত পৌঁছে যায় কিন্তু যে প্রশ্ন সেখানেও অবধারিতভাবে উঁকি মারে তা হলো, অনুবাদ, প্রকৃত আবেগ অবিকৃতভাবে পরিবেশন করতে পারে কি না। ভাষার এই বাধা দূর হতে পারে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে। চলচ্চিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষায় কাব্যচর্চা যারা করেন তাঁদের কাছাকাছি আসার একটা মঞ্চও তৈরী হতে পারে। যে মঞ্চ পারস্পরিক আদান প্রদানের পাশাপাশি আরও প্রভাবময় কবিতা সৃষ্টির প্রেরণা জোগাবে। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় জানা গেছে যে,, উত্তর পূর্বাঞ্চলে বসবাস করেন এমন বিভিন্ন ভাষা গোষ্ঠী মানুষের মধ্যে বাঙলা ভাষায় কথা বলা মানুষেরাই সংখ্যাগুরু। এই ভাষায় সাহিত্য ও কবিতা চর্চা বহুদিন ধরেই ত্রিপুরার পাশাপাশি, কাছাড়, ধুবড়ী, গৌহাটি, নওগাঁও, শিলং প্রভৃতি অঞ্চলে হয়ে চলেছে, অথচ, পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদানের উপযুক্ত কোন ব্যবস্থা এখন অব্দি গড়ে ওঠেনি বলে একে অপরের সৃষ্টি কর্ম সম্বন্ধে বিশেষ ওয়াকিবহাল নন। আর সাধারণ পাঠকের সঙ্গে ঐ সব অঞ্চলের কবিতার পরিচয়ের তো বিশেষ কোন বিনিময় পদ্ধতি এই অঞ্চলে তৈরী করার সচেতন প্রচেষ্টার কথাও বিশেষ শোনা যায় না। এই বিশাল সংখ্যাক বাঙালীদের জীবনের কথা নিয়ে হাতে গোণা যে কয়টি চলচ্চিত্র তৈরী হয়েছে সেগুলোও যথোযুক্তভাবে প্রদর্শিত হতে পারেনি। যদিও এখানকার বাঙালীদের জীবনবোধের সঙ্গে বৃহৎ বঙ্গভাষী অঞ্চলের মধ্যে একটা গুণগত পার্থক্য রয়েছে। একই ভাষার সৃষ্টিসমুহ যেখানে নানা কারণে এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে পৌছুতে পারছে না সেখানে ভিন্ন ভাষায় সৃষ্ট কবিতা সমূহের সঙ্গে পরিচিত হওয়া মুষ্টিমেয় অল্প সংখ্যক উৎসাহী কবি প্রেমিক ছাড়া বিশেষ কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এ সবেরই ফলশ্রুতিতে ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার পাশাপাশি মানসিক বিচ্ছিন্নতার বাতাবরণ সৃষ্টি হয়। বিচ্ছিন্নতা এমন মাত্রায় পৌঁছে যায় যখন মনোরমা হত্যার মত ঘটনায়ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মানুষ মূক হয়ে থাকতেই স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। এই বিচ্ছিন্নতাই যে অনেক বিস্ফোরক কার্যকলাপের প্রধান কারণ সে কথা সবারই জানা। এ কথাও বোঝা হয়ে গেছে যে, শুধুমাত্র প্রশাসনিক পদ্ধতিতে বিচ্ছিন্নতার জড় উপড়ে ফেলা যাচ্ছে না। এ কাজে প্রত্যেকেরই সহযোগিতা করার প্রয়োজন রয়েছে। শিল্পকর্মে নিয়োজিত মানুষদেরই একথা বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে যে নিজেদের সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমে কিভাবে আরো বেশি করে নিজ অঞ্চলের বাইরের মানুষের কাছে পৌঁছানো যেতে পারে। কবিতা এবং চলচ্চিত্র হতে পারে এই বাঁধ ভাঙ্গার প্রধান হাতিয়ার। মানুষের পক্ষে চলচ্চিত্র আবিষ্কার করা সম্ভব ছিল না, যদি না সে স্বপ্ন দেখত। একইভাবে, কবিতা যিনি রচনা করেন তিনিও

স্বপ্নাবিষ্ট হয়েই কাব্য রচনাকে সম্ভাবনাময় করে তুলতে পারেন। স্বপ্ন দেখার মানবিক অধিকার থেকে আমরাও এ ধরনের স্বপ্নের জাল বুনতে পারি যে, বিশেষ করে উত্তর পূর্বাঞ্চলের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক আদান প্রদানের সুস্থ বাতাবরণ কবিরাই গড়ে তুলবেন। আর সে লক্ষ্যে ঈর্ষণীয় সংখ্যক কাব্যচর্চায় নিবেদিত তরুণদের উপস্থিতিতে ধন্য এই রাজ্যের কবিরাই অগ্রণী হবেন।

চরম পর্যায়ে চলচ্চিত্রর স্থান
সঙ্গীত ও কবিতার মাঝখানে
সে দুটো একই রকম বিষণ সুন্দর
আর মহৎ
চলচ্চিত্র নির্মাতা
মহান বিষণ সুন্দরের শিল্পী।
আরো একজন কবির মতই
মর্মান্তিক ভাষায় তিনি বলে গেছেন-
মোমবাতির মত জ্বলে জ্বলে
আজ আমি নিঃশেষ
মোমবাতিটি নিভিয়ে রাখো
উৎসবের দিনে কাজে আসবে....।
নীলমণি ফুকন--
'চিত্রায়িত জীবন থেকে'।

চলচ্চিত্র চিন্তা (৫)

যে সমাজ ব্যবস্থায় চলচ্চিত্র প্রদর্শনের প্রথাগত প্রচলিত পদ্ধতির দ্বার একের পর এক বন্ধ হয়ে যায় সেখানে চলচ্চিত্র নির্মাণের ধারাবাহিকতা বজায় রাখাটা যুক্তিগ্রাহ্য প্রক্রিয়ারূপে খুব স্বাভাবিকভাবেই বিবেচিত হওয়ার কথা নয়। দীর্ঘ সময় ধরে গড়ে ওঠা চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রচেষ্টাগুলো প্রধানত সে কারণে একটা সংঘবদ্ধ প্রক্রিয়ার পার্শ্বক্রিয়ারূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি। যা নিঃসন্দেহে প্রভাবিত করেছে এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্বলিত ছোট বাজেটের সেলুলয়েড নির্মিত চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রকল্পগুলো। সেই সঙ্গে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা অন্য সমাজের জন্য ভিন্ন ধারা চলচ্চিত্র সচেতনতা। পাশাপাশি, বিনোদনের আড়ালে বাস্তববর্জিত বড় বাজেটের নির্মিতিগুলো কিন্তু প্রদর্শনের প্রচলিত পদ্ধতির বাইরে আরও একটা সংগঠিত ও শক্তিশালী প্রদর্শন ব্যবস্থার মাধ্যমে গরিষ্ঠাংশ দর্শকের কাছে পৌছে যেতে পারে। যে প্রদর্শন ব্যবস্থা ঐ সমস্ত ছবি নির্মাতাদের বিশেষ ব্যরসায়িক দৃষ্টিভঙ্গীজাত একচেটিয়া প্রদর্শন ব্যবস্থারূপেই আত্মপ্রকাশ করে থাকে। যেখানে, ছোট বাজেটের আঞ্চলিক ভাষায় নির্মিত ছবিগুলোর প্রবেশ প্রায় নিষিদ্ধ। যে সমস্ত চলচ্চিত্রের প্রদর্শন প্রচলিত পদ্ধতিতেই যথেষ্ট সমস্যাসংকুল পথ অতিক্রম করে যেতে হয় সেখানে এ ধরনের বিকল্প প্রদর্শন ব্যবস্থার শরিক হওয়া যে অসম্ভবকে সম্ভব করার সামিল এ কথা বুঝতে বিশেষ অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। এই সবের অবশ্যম্ভাবি পরিণতিতেই, চলচ্চিত্র নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয়গুলো যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করতে পারে না। নৈবর্তিক এই প্রক্রিয়ার প্রতিফলন সামাজিক স্তরে ভিন্ন ভাষায়, ভিন্নভাবে লক্ষ্য করা যায়।

চলচ্চিত্র নির্মাণ পদ্ধতি ও প্রকরণের মধ্যে প্রবেশ না করে এবং নিজেকে যথেষ্ট পরিশীলিত না করে যারা ভিডিওগ্রাফিকে সিনেমা শিল্পের সমপর্যায়ভুক্ত বলে দাবী করে বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করে চলেছেন তাদের গরিষ্ঠাংশের মধ্যেই যে নৈবর্তিক প্রক্রিয়ার প্রতিফলন ঘটে চলেছে, এ বিষয়ে সন্দেহের বিশেষ অবকাশ নেই। ভিডিওগ্রাফি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত শক্তিশালী এবং স্মার্ট মাধ্যম। টেকনোলজির ক্রম উন্নতি ভিডিও ক্যামেরাকে যথেষ্ট উন্নত করেছে। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে সেই ভিডিও ছবিকে ব্লো আপ করে ৩৫ মিঃমিঃ পর্যন্ত করা এখন সম্ভব। তাই বলে, বিষয়টা সেলুলয়েড হয়ে যায় না। ভিডিওগ্রাফিই থাকে। মাধ্যমটির সীমাবদ্ধতাসহ।

ভিডিওগ্রাফির সীমাবদ্ধতা দূর করার নিরন্তর প্রচেষ্টা এখনও চলেছে, তা সার্থকতা পেলে পর সেলুলয়েডের পাশাপাশি এই আধুনিক মাধ্যমটির তুলনামূলক আলোচনা সম্ভব। সে অন্য প্রসঙ্গ। বহিঃবিশ্বের সঙ্গে সুস্থ সম্মত সহজ যোগাযোগের পদ্ধতিগুলো যখন বন্ধ হয়ে যায় তখন বাইরের আলো ও হাওয়া সাবলীলভাবে প্রবেশ করতে পারে না। এই যে আলো আঁধার এর মধ্যেই লুকিয়ে থাকে অর্ধসত্যর সব উপকরণ। প্রাকৃতিক স্যাঁত স্যাঁতে পরিবেশের সঙ্গে মানানসই এমন এক নৈবর্তিক মানসিকতা গড়ে উঠে যেখানে অর্ধসত্য বেশ শক্তপোক্তভাবে শেকড় গাড়তে পারে। অর্ধসত্যর তাৎক্ষণিক প্রভাব যে সংশ্লিষ্ট প্রতিভূদের যথেষ্টই প্রভাবিত করতে পেরেছে তাদের কার্যপদ্ধতি থেকে তা উপলব্ধি করা যায়। অথচ, অডিও-ভিসুয়াল মাধ্যমকে ভিত্তি করে সুপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠা অর্ধ সত্যর বুলেট প্রতিহত করে প্রকৃত সত্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য শুধু একটু সদিচ্ছার প্রয়োজন। সিনেমার ব্যাকরণ ও শিল্পগত ব্যবহার নিয়ে গত একশ বছরেরও বেশি সময় ধরে যত বিচার বিশ্লেষণ, তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ঘটে চলেছে তা থেকে এই শিল্প মাধ্যমটির সজীব উপস্থিতির কথাই প্রতীত হয়। সিনেমা নিয়ে এই সকল আলোচনা আবর্তিত হয়েছে সেলুলয়েড মাধ্যমে সৃষ্টি শিল্পকলাকে কেন্দ্র করে। সিনেমা সৃষ্টির শুরু থেকে এই সময় পর্যন্ত সেলুলয়েড নির্ভর মাধ্যমটিই সিনেমা বলে চিহ্নিত হয়েছে। দীর্ঘ একটা সময় পর্যন্ত সিনেমা বিশেষভাবে প্রস্তুত যান্ত্রিক উপকরণ ও বন্দোবস্ত ছাড়া প্রদর্শিত হওয়া সম্ভব ছিল না। ইদানিং উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর বিভিন্ন প্রদর্শন উপকরণের সাহায্যে সে সকল উপকরণ ছাড়াও হলিউডের ছবি ঘরে বসে দেখা যায়। প্রদর্শনের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির এই প্রভাব সামগ্রিকভাবে সিনেমাকেই আঘাত করে। কিন্তু, নির্মাণগত প্রকৌশলের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ধারাবাহিক উন্নততর প্রক্রিয়া পদ্ধতির আবিষ্কার এখনও সিনেমার মহিমাকে ম্লান করতে পারেনি। সিনেমা এখনও সারা বিশ্বে সেলুলয়েড নির্মিত হয়েই অস্কার পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হয়। অন্য কোন পদ্ধতি, বিশেষ করে ভিডিওগ্রাফিতে ছবি তুলে প্রযুক্তির সাহায্যে বড় পর্দায় প্রদর্শিত করে সিনেমা বলে চালিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা এখনও স্বীকৃতি লাভ করেনি। যে কারণে, সেলুলয়েড বহির্ভূত উপকরণে নির্মিত শিল্প সৃষ্টিসমূহ অন্য পরিচয়ে পৃথিবীজুড়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশে প্রদর্শিত হয়ে থাকে।

টেলিভিশন আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ঐ মাধ্যমে প্রদর্শিত হওয়ার উপযুক্ত যান্ত্রিক উপকরণের প্রয়োজনীয়তার কথা গুরুত্ব পেতে শুরু করে। সেই চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে নিরন্তর গবেষণা বর্তমান স্তরের ডিজিটাল ভিডিও ক্যামেরা থেকে নন লিনিয়ার এডিটিং পদ্ধতির স্তর পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। এখনও ভিডিওগ্রাফিকে আরো উন্নত করার যে প্রচেষ্টা রয়েছে সেখানে লক্ষ্য স্থির হয়ে রয়েছে, সেলুলয়েডের উচ্চতায় পৌঁছানো। ভিডিও ক্যামেরার ক্ষেত্রে এত দ্রুতগতিতে উন্নতি ঘটে চলেছে যে নিত্যনতুন আবিষ্কার অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে আগের প্রযুক্তিকে বাতিল প্রতিপন্ন করে দিচ্ছে। কম আলোয় খুব দ্রুত ঝকঝকে ছবি তোলা যায় বলে ভিডিও ক্যামেরার এত উন্নতির পরও কিছু কিছু খামতি এখনও দূর করা সম্ভব হয়নি যে কারণে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীজাত দৃশ্যভাবনার প্রকৃত প্রতিফলন এর সাহায্যে ঘটানো এখনও সম্ভব নয়। এই অক্ষমতার জন্যই টেলিভিশনের জন্য ছবি তৈরী করতে গিয়ে বহু পরিচালক সযত্নে ভিডিও ক্যামেরা পরিহার করে সেলুলয়েডে নির্মাণ করেছেন। সত্যজিৎ রায়ের 'সদ্‌গতি', 'পিকু' ৩৫ মিঃমিঃ ক্যামেরায় সেলুলয়েডে তোলা। এমনকি সন্দীপ রায় তেরো এপিসডের সত্যজিৎ রায় প্রেজেন্টস-ও ৩৫ মিঃ মিটারেই তুলেছেন।

সঞ্জয় খানের 'টিপু সুলতান', এবং এমন আরো অনেক টেলিভিশনের জন্য নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম ভিডিও ক্যামেরায় তোলা হয়নি।

প্রযুক্তির অন্য সব মাধ্যমের মত মাস মিডিয়ার এই ক্ষেত্রটিও অনেকের কাছে অতি মুনাফার মোক্ষম উপায়রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এতে করে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তাতে অনেকাংশে প্রযুক্তিকেই ভিলেন করে দেয়া হয় যা প্রচ্ছন্নে সেইসব নৈবর্তিক মানসিকতাসম্পন্ন তথাকথিত শিল্প স্রষ্টাদের উৎসাহিত করে। এ বিষয়ে সন্দেহের বিশেষ অবকাশ নেই যে বিকৃত মনস্কতা, অপরাধ প্রবণতা এসব সমাজের মধ্যেই রয়েছে। তার কারণ অনুসন্ধান করাটা সমাজ বিজ্ঞানীদের দায়িত্ব। তবে থোড় বড়ি খাড়া আর খারা বড়ি থোড় এ পর্য্যুদস্ত জীবনে হাঁপিয়ে ওঠা মানুষের কৌতূহল যখন চরিতার্থ হওয়ার স্বাভাবিক সব পথ বন্ধ দেখে তখন অবদমিত আকাঙ্খা বহিঃপ্রকাশের নিজস্ব পন্থা তৈরী করে নেয়। যে পন্থাপদ্ধতি শুধু পৃষ্ঠপোষকতাই পায় না বরং লালিত পালিত হয়ে চলেছে এই সমাজেরই নিরাপদ প্রকোষ্ঠে।

আপাত দৃষ্টিতে সেলুলয়েড এবং ভিডিওগ্রাফিতে বিরোধের কোন জায়গা নেই। প্রধানতঃ দুই ধরনের পদ্ধতিই ব্যবহৃত হয়ে থাকে ভিন্ন মাধ্যমে প্রদর্শিত হওয়ার জন্য। ভিডিওগ্রাফির মত সেলুলয়েডে তাৎক্ষণিকভাবে ছবি প্রদর্শন সম্ভব নয় বলেই ভিডিওগ্রাফি মূলতঃ সংবাদ সংগ্রহ ও পরিবেশনের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে বিজ্ঞানের উল্লেখযোগ্য অবদান। বেশীদিন শুধুমাত্র সংবাদ পরিবেশনই মাধ্যমটির একমাত্র প্রধান উদ্দেশ্য বলে বিবেচিত হতে পারেনি। টেলিভিশনের সুদূর প্রসারী শক্তির কথা উপলব্ধি করে মাধ্যমটিকে স্বপক্ষে ব্যবহার করার প্রতিযোগিতা বিভিন্ন স্তরে শুরু হয়ে যায়। টেলিভিশনের শ'পাঁচেক চ্যানেলের রাত দিন সম্প্রচার বজায় রাখার জন্য এবং বিশেষ করে স্পন সরদের বিজ্ঞাপনের ফাঁক-ফোকর ভরে দেয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয়ে পড়লো। খুব কম সময়ে কম খরচে বেশি বেশি অনুষ্ঠান প্রযোজনার ক্ষেত্রে ভিডিওগ্রাফি নিঃসন্দেহে অতি প্রয়োজনীয় এক হাতিয়ার। সেলুলয়েডের কবিতা সৃষ্টি ভিডিও'র লক্ষ্য নয়। যা ক্রমে, একই সেটে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান প্রযোজনার ক্ষেত্রে পারদর্শিতা লাভ করতে শুরু করে, যেখানকার বেশিরভাগ ঘটনাই আবর্তিত হয় চার দেয়ালের মধ্যে। এছাড়াও, ইদানিং প্রায় প্রতিটি চ্যানেলেই সিনেমা প্রদর্শিত হয়ে থাকে যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দুঃখময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। এমনিতেই আমাদের দেশের বেশিরভাগ সিনেমা হলেরপ্রজেকশান ব্যবস্থা ভাল নয়। যে কারণে, দীর্ঘদিন পরিকল্পনা করে বহু শ্রম ও অধ্যবসায়ে যে বিশেষ দৃশ্যের সৃষ্টি করা হয় সে দৃশ্য প্রজেকশনের দোষে সঠিকভাবে পর্দায় প্রতিফলিত হতে পারে না এবং আশানুরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরী করতে ব্যর্থ হয়। বড় পর্দার জন্য নির্মিত ছবি বড় পর্দায় প্রদর্শিত হয়ে যেখানে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয় সেখানে সেলুলয়েড ছবিকে যখন ভিডিওগ্রাফিতে রূপান্তর করে ক্যাসেটের সাহায্যে প্রদর্শন করা হয় তখন ছবিটির অবস্থা কি দাঁড়ায়? আলোর কোন বিশেষত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না, শব্দের আলাদা তাৎপর্য খুঁজতে যাওয়া বোকামি। মাধ্যমের সীমাবদ্ধতা থেকেই এরকম হয়ে থাকে যে কারণে উপযুক্ত মাধ্যমেই ভিসুয়ালগুলো প্রদর্শিত হওয়াটা কাঙ্খিত। তাহলেই শিল্পসৃষ্টিগুলো যথোপযুক্তভাবে বিবেচিত হওয়ার দাবী করতে পারে। যে সকল স্থানে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের প্রথাগত সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে গেছে সেখানে মাধ্যমগুলোর স্বকীয়তা অনুযায়ী ভিন্ন প্রদর্শন পদ্ধতির প্রচলন সম্ভব নয়। তাছাড়া, যেহেতু একই প্রদর্শন প্রক্রিয়ায় দ্রুত মুনাফা করা সম্ভব সে জন্য শিল্পকলার

চরম অবমাননার বিষয়টি কখনই বিবেচ্য হয় না। অতি মুনাফাই মাধ্যমগুলোর প্রকৃত প্রয়োগের ক্ষেত্রে বড় অন্তরায় সৃষ্টি করে। ভিডিওগ্রাফির সঠিক এবং উপযুক্ত ব্যবহার সমাজে সুদূর প্রসারী প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম। বিশেষ করে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এই মাধ্যমটির জনপ্রিয়তা ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় তাদের শিক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যে সংশয়াতীতভাবে প্রমাণ করেছেন। এই প্রক্রিয়া বিশেষ করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষদের বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য দিয়ে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই পদ্ধতির ব্যবহার এই অঞ্চলে প্রচলিত হওয়া এ কারণে বিশেষ প্রয়োজনীয় যে, এখানকার বিচ্ছিন্নভাবে গড়ে ওঠা দূর প্রান্তের জনপদে প্রথাগত শিক্ষণ পদ্ধতি নানা কারণে নানাভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। সেসব গ্রামের মানুষদের নিজের দেশের, জাতির সঙ্গে বোঝাপড়া তৈরী করার লক্ষ্যে এবং বহির্বিশ্বের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য এই মাধ্যমটির প্রয়োগ পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে গড়ে তোলা সম্ভব। অডিও ভিস্যুয়াল মাধ্যমের সাহায্যে শিক্ষাদান করা যেতে পারে, যা, এই অঞ্চলের ড্রপ আউট ছাত্র সংখ্যার হার কমিয়ে আনতে সাহায্য করবে। পাশাপাশি সেলুলয়েড নির্মিত চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ও সে সম্পর্কে আলাপ, আলোচনার পরিবেশ তৈরী করার প্রয়াস এই মাধ্যমগুলো সম্বন্ধে মানুষকে সম্যক ধারণা তৈরী হতে সাহায্য করবে। মানুষের মনে তৈরী হওয়া বিভ্রান্তি দূর করে দিতে পারলেই আধুনিক বিশ্বের অত্যন্ত শক্তিশালী প্রযুক্তিনির্ভর এই মাধ্যমকে যথেচ্ছভাবে বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার প্রবণতা সম্বন্ধে অবহিত করা সম্ভব। তাহলে, অডিও ভিসুয়াল মিডিয়ার ইতিবাচক প্রভাব সমাজ সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ার ক্ষেত্রে সদর্থক ভূমিকাই পালন করবে।

চলচ্চিত্র চিন্তা (৬)

উত্তর পূর্বঞ্চলে বসবাসকারী বিভিন্ন ভাষা গোষ্ঠী মানুষের জীবন চিত্রায়িত হয়ে বৃহত্তর মানব সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করার ঘটনা খুব বেশি পুরনো নয়। অন্য সমাজের জন্য ভিন্ন ছবির ভাবনাকে আত্মস্থ করে গুণগত উৎকর্ষে সমৃদ্ধ যে সকল চলচ্চিত্র সাম্প্রতিককালে নির্মিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে উত্তর পূর্বাঞ্চলের আদিবাসীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ 'মানিক রাইতং' ছবির আগে পর্যন্ত বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারেনি। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার প্রান্তিক সীমানায় বসবাসকারী আদিবাসী সমাজের চলচ্চিত্রে প্রকৃত উপস্থিতির সাম্প্রতিক ঘটনাবলির মধ্যে'মানিক রাইতং''লংতরাই' 'ওসোবিপু' 'হাগরা মাই হারে জেনা হারী' ' লাঙমনি হাদুক' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। সেলুলয়েডের বাইরে ভিডিও ফর্মাটেও ইদানীং বেশ কিছু ছবি নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, মেঘালয়, ত্রিপুরায় সেই সব মানুষের অংশগ্রহণে তৈরী হচ্ছে যারা দীর্ঘদিন চলচ্চিত্র মাধ্যমটিতে ব্রাত্য ছিলেন। এই অঞ্চলের প্রদেশগুলো বিভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতির ছোট ছোট গোষ্ঠীভূক্ত মানুষের উজ্জ্বল স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ। প্রকৃতির কোলে লালিত এই সব মানুষের জীবন নিয়ে ছবি করার কথা তথাকথিত মূলস্রোত চলচ্চিত্র নির্মাতাদের ভাবনায় অন্ততপক্ষে 'ইয়ে গুলিস্তান হামারা'র আগে পর্যন্ত বিশেষ গুরুত্ব পায়নি। যদিও, ঐ ছবিতে প্রতিফলিত আদিবাসী জীবনের প্রতিচ্ছায়া এই অঞ্চলের মানুষের মনে মূলস্রোত চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা তৈরী করতে পারেনি। সম্ভবত এই ধরনের অনাবিষ্কৃত জীবনধারা চিত্রায়ণ যে সহমর্মিতা দাবী করে তা চলচ্চিত্র নির্মাতারা সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারেনি বলেই এই অঞ্চলের সমাজ জীবনের যথার্থ চিত্রায়ণে মূলস্রোতের ছবিগুলো ব্যর্থ হয়েছে। দর্শকরূপে দীর্ঘদিন এই অবহেলা ও অবজ্ঞা নীরবে মেনে নেয়া ছাড়া যাদের কোন উপায় ছিল না তাদের মধ্যে মণিপুরী চলচ্চিত্র ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে সক্ষম হলো। মণিপুরী চলচ্চিত্রের আলোয় যখন এই অঞ্চলের বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ উদ্ভাসিত প্রায় সে সময় সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চল জুড়ে বিক্ষিপ্তভাবে শুরু হলো জাতিসত্তা বিকাশের আন্দোলন। সত্তর দশকের মাঝামাঝি থেকে শুরু হওয়া অসমীয়া জাতি সত্তার অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলন উত্তর পূর্বাঞ্চলের মানুষের মধ্যে এক গভীর আত্মপ্রত্যয়ের মানসিকতা তৈরী করতে পেরেছিল। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এই পরবর্তী পর্যায়ে অসমীয়া সাহিত্য ও চলচ্চিত্র

জাতীয় পর্যায়ে সৃষ্টিশীল কার্যক্রমের মধ্যে আরো স্পষ্ট প্রভাব ফেলতে পেরেছে। শুধু অসম নয় এর ঢেউ উদ্বেল করেছিল বিভিন্ন ভাষা গোষ্ঠীব বিশেষ করে বড়ো ও মনখেমর ভাষী মানুষদেরও যা এসব ভাষায় সাহিত্য, নাটক এমনকি চলচ্চিত্র চর্চার ক্ষেত্রে তাদের যথেষ্টই উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিল। বড়ো সাহিত্য সম্মেলন এর মত সংগঠন বড়ো ভাষায় সৃজনশীল কর্মকান্ডে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করার ক্ষেত্রে সবসময় অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। শীতল শিলং শহরের উত্তাপও যখন বাড়তে বাড়তে সত্তর দশকের শেষে পূর্ণমাত্রা পেয়ে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতে লাগলো তখনই সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চল জুড়ে তৈরী হতে শুরু করলো এক চাপা বৈরিতা। আটের দশকের গোড়ায় সমগ্র অঞ্চল জুড়ে ঘটে গেছে সব কলঙ্কজনক ঘটনা। এরকম এক বিশ্বাসহীনতার প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে খাসি জাতিগোষ্ঠীর চলচ্চিত্র মানিক রাইতং শুরু হয়।

উত্তর পূর্ব ভারতে বসবাসকারী আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে বড়ো ভাষা গোষ্ঠীর মানুষেরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই সমস্ত মানুষের মধ্যে ক্ষুদ্র একটা অঞ্চলে মনখেমর ভাষা গোষ্ঠীর খাসি জনগণের উপস্থিতি এক কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা। চারদিক থেকে ঘিরে থাকা মঙ্গোলীয় ধারার মানুষের মাঝে মেঘালয়ের খাসি ও জয়ন্তিয়া পাহাড় অঞ্চলে বসবাসকারী অস্ট্রিক এই মানুষেরা আশ্চর্যজনকভাবে নিজেদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট বজায় রেখে চলেছেন। মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ধারক, কল্পনাপ্রবণ, সৃজনশীল, নরম মনের খাসি জাতির মানুষদের নিয়ে বড় মাপের ছবি তৈরীর কাজ শুরু হলো আটের দশকের গোড়ায়। সমাজ জীবনের অস্থিরতা স্তিমিত হয়ে জাতির আত্মপ্রত্যয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র তৈরী হওয়ার ক্ষেত্রে এরকম সামাজিক পটভূমিকায় চলচ্চিত্র মাধ্যমটির অবদান অনস্বীকার্য। প্রকৃতপক্ষে খাসি জাতীগোষ্ঠীর জনপ্রিয় লোককাহিনী মানিক রাইতং চলচ্চিত্রায়ণের সাহায্যে এই প্রথম প্রকৃত মানুষ প্রকৃত প্রেক্ষাপটে অভিনয় করে প্রমাণ করে দিলেন যে সুযোগ পেলে আদিবাসী বলে যাদের চিহ্নিত করা হয়ে থাকে তারাও চলচ্চিত্রে সাবলীল পদচারণা করতে পারেন। এ ধরনের ছবি নির্মাণের সময় সমগ্র জাতি গোষ্ঠীর মানুষ নানাভাবে যে রকম অংশগ্রহণ করতে এগিয়ে আসেন তাতে আদিবাসী সমাজ চিত্রায়িত চলচ্চিত্রগুলো তাদের দীর্ঘলালিত আকাঙ্খা বাস্তবায়নের দলিল হয়ে পড়ে। একইভাবে, মানিক রাইতং শুধুমাত্র কিছু অভিনেতা ও চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মানুষের ছবি হয়ে থাকেনি। এই ছবি হয়ে যায় সমগ্র খাসি জাতির ছবি। আরও ব্যাপক অর্থে উত্তর পূর্বাঞ্চলের আদিবাসী মানুষের আশা আকাঙ্খার প্রতীক। ভাষা যে সেখানে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না তা বোঝা গেল, শিলং শহরের সবচেয়ে আধুনিক ও বড় সিনেমা হলে মানুষের ঢল থেকে। অথচ এখানেই বড় বাজেটের হিন্দী ছবি 'ইয়ে গুলিস্তান হামারা' চলতে পারেনি। মানিক রাইতং নির্মাণের সময় থেকে সমগ্র মেঘালয় জুড়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে অভাবনীয় উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা গেছে তার রেশ ছবির প্রদর্শনীতেও অটুট থেকেছে। এই সহযোগিতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণই ছবিটিকে খাসিদের জাতীয় চলচ্চিত্রের পর্যায়ে নিয়ে গেছে। 'মানিক রাইতং' নিঃসন্দেহে এই অঞ্চলের এক উল্লেখযোগ্য ছবি।

মানিক রাইতং এর প্রায় সমসাময়িক কালে লংতরাই ছবির নির্মাণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। আশি সালের রক্ত ঝরা ক্ষতর দাগ তখনও পুরোপুরি শুকিয়ে যায়নি। গৌরবোজ্জ্বল জনশিক্ষা আন্দোলনের পরশ যাদের আন্দোলিত করেনি সেই আদিম জনগোষ্ঠীভুক্ত রিয়াং মানুষদের জীবনগাথা নিয়ে চলচ্চিত্র তৈরীর কথা ভাবা শুরু হলো। নানা প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে অবশেষে সে ছবি মুক্তি পেল। লংতরাই ছবির পটভূমি তৈরী হয়েছে লংতরাই পাহাড়কে কেন্দ্র করে। পবিত্র পাহাড় যাদের

জীবন জীবিকা, তাদের সক্রিয় সহযোগিতা ও অংশগ্রহণেরই ফসল লংতরাই ছবি। চলচ্চিত্র মাধ্যমটি আবিষ্কারের প্রায় শতবর্ষ পর এই রাজ্যের প্রতিভাবান মানুষের সামনে সিনেমার দ্বার অর্গলমুক্ত করে দিয়েছিল যে ছবি সেই লংতরাই নিয়ে কৌতূহল আজও বিদগ্ধ সমাজে বর্তমান।

লংতরাই'র কাহিনী আবর্তিত হয়েছে জুমিয়া কৃষক পরিবারের জীবন সংগ্রামকে কেন্দ্র করে। জুম কেন্দ্রিক প্রেম ও বন নির্ভর জীবনের কাহিনী চলচ্চিত্রে রূপায়ণের জন্য যারা অভিনয় করেছেন তাদের বেশিরভাগই জুমিয়া। আসলে এই ধরনের ছবিতে,অভিনয় বলতে সাধারণভাবে যা বোঝানো হয় তা বোধ হয় কেউই করেন না। কারণ এখানে প্রকৃত চরিত্ররাই প্রকৃত পরিবেশের প্রেক্ষাপটে নিজের কথাটা বলেছেন। যে সকল মানুষের সিনেমা দেখারই কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না, ক্যামেরা রিফ্লেক্টরের মাঝে দাঁড়িয়ে সেই সব মানুষের সঠিকভাবে নিজ নিজ অভিব্যক্তির প্রকাশ প্রতিফলিত করতে পারাটা নিঃসন্দেহে বিরল ঘটনা। এই বিরল কৃতিত্বের অধিকারী রিয়াং জাতীগোষ্ঠীর অভিনয়, নৃত্য ও সংগীতে সমৃদ্ধ চলচ্চিত্র, ভিন্নভাষী মানুষের মধ্যে আবেগ সঞ্চার করতে পেরেছিল। যারা একথা বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে রিয়াংদের পক্ষে সম্ভব হলে আমাদের পক্ষেও সম্ভব। আর এই বোধেরই প্রতিফলন পরবর্তী সার্থক প্রচেষ্টাগুলিতে লক্ষ্য করা যায়। চলচ্চিত্র তখন নিছক প্রমোদের বস্তু থাকে না। আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রচেষ্টার গুরুত্ব অপরিসীম।

নানাভাবে দীর্ঘদিন এই অঞ্চলের মানুষের সংস্কৃতি তুলনামূলক নিকৃষ্ট পর্যায়ের এই ধারণা বদ্ধমূল করার ধারাবাহিক প্রচেষ্টা বজায় ছিল। যা, নিঃসন্দেহে একটা পর্যায় পর্যন্ত একথা বিশ্বাস করার মত পরিস্থিতির উদ্ভব করতে পেরেছিল। আত্মবিশ্বাস হারিয়ে গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেয়ার নিরুপদ্রব, শান্ত এই সময়ে একটি চলচ্চিত্রের পক্ষে হৃত বিশ্বাস ফিরে পেতে সাহায্য করা সম্ভব কিন্তু সম্পূর্ণভাবে সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজন, সামাজিক পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ণ। সাতের দশক থেকে আটের দশকের কিছু সময় পর্যন্ত এই অঞ্চলের সামাজিক ক্রিয়াকান্ডও হৃত সম্মান পুনঃস্থাপনে যথেষ্টই ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পেরেছিল। চলচ্চিত্রও সেখানে সামাজিক ক্রিয়াকান্ডের অঙ্গ হয়ে যায়। এরই প্রতিফলন পরবর্তী পর্যায়ে, কার্বি আংলঙ মানুষের ছবি 'ওসো বিপু'তে লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃতপক্ষে এই অঞ্চল জুড়ে আদিবাসী জীবন নির্ভর ছবি তৈরীর একটা প্রক্রিয়া সেই থেকে শুরু হয়ে যায়। সেই প্রক্রিয়ার ফলে ককবরক ভাষী মানুষের জীবন নির্ভর ছবি লাঙমনি হাদুক তৈরী হয়। বড়ো ভাষায় আসাম থেকে তৈরী হলো 'হাগরা মাই হারে জেনা হারী' এছাড়াও প্রায় প্রতি বছর এই ভাষায় নিয়মিত ছবি তৈরী হয়ে চলেছে। গারোদের জীবন নিয়েও নয়ের দশকের গোড়ায় তৈরী হয়েছে ঐ ভাষার ছবি। আদিবাসীদের জীবন নির্ভর এই সব কাহিনী বিভিন্ন উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে। পৃথিবী জুড়ে অনুষ্ঠিত সেই সব উৎসবে প্রদর্শনীর মাধ্যমে ঐ সকল ছবি চলচ্চিত্র বোদ্ধাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে। এই অঞ্চলের বাইরের মানুষ এই সব ছবির মাধ্যমে এমন এক জীবনের সাক্ষাৎ পেলেন যার সম্পর্কে অধিকাংশেরই পূর্ব কোন ধারণা ছিল না। প্রকৃতির রঙ, রস, রূপ, গন্ধ, ভুলে যাওয়া উৎসবমুখী সেইসব মানুষের উজ্জ্বল অভিব্যক্তি আবার প্রমাণ করল যে মানুষ চাকচিক্যের খোলসটা প্রাণ থেকে চায় না। সবুজের মধ্যে জীবন সংগ্রামে রত ন্যূনতম সুযোগ সুবিধা বঞ্চিত মানুষের সাদামাটা জীবনবোধ, মানুষেরই অস্তিত্বকে শক্তিশালী বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড় করায়। কারিগরী দিক থেকে ভীষণ সাদামাটাভাবে তৈরী সেই সব চলচ্চিত্র প্রধানতঃ উপস্থাপনা ও চরিত্রায়ণের গুণে অন্য সমাজের কথা বিশ্বস্তভাবে

পরিবেশন করতে পেরেছে বলেই সার্বজনিন আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। সহজ সরল জীবনের সাথে সহজ শট নির্ভর কারিগরীই মানানসই হয়েছিল। এই ছবিগুলো একদিকে যেমন দর্শকদের একটা নতুন জীবন দর্শনের মুখোমুখি করে দিল অন্যদিকে আদিবাসী মানুষকে সৃষ্টিশীল ক্রিয়াকর্মে উদ্দীপিত হতে সাহায্য করলো। সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চল জুড়ে আদিবাসী জনগণের চলচ্চিত্র নির্মাণের যে জোয়ার এসেছিল নয়ের দশকের শেষের দিকে ক্রমশ তা স্তিমিত হয়ে গেল প্রধানত অসম প্রদর্শনীজাত পৃষ্ঠপোষকহীনতার কারণে। শুধুমাত্র সততা, নিষ্ঠা ও ভালোবাসা সম্বল করে যে সব ছবি তৈরী হলো সেগুলো প্রদর্শনের ব্যবস্থা করার ক্ষমতা সেই সব সৃষ্টিশীল মানুষের কোনদিনই ছিল না। চলচ্চিত্র শিল্পের নিয়ম অনুযায়ী তৈরী হয়ে যাওয়ার পর পণ্যে রূপান্তরিত হয়ে যায়, যা বিক্রী করে মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হলেই ব্যবসায়ীরা আকৃষ্ট হন। সিনেমা প্রদর্শনের যে প্রথাগত ব্যবস্থা বর্তমান এই অঞ্চল জুড়ে রয়েছে সেখানে আদিবাসীদের জীবন নির্ভর ছবি বিপণনের কথা এখন পর্যন্ত বিশেষ গুরুত্ব পায়নি। যেহেতু আদিবাসী সমাজের গরিষ্ঠাংশ প্রথাগত সিনেমা প্রদর্শনীর স্থান থেকে যথেষ্ট দূরত্বে বাস করেন তাদের পক্ষে দল বেঁধে রোজ শহরে এসে ছবি দেখা বাস্তবিক কারণেই সম্ভব নয়। ফলে ছবি প্রদর্শিত হলেও কাঙ্খিত দর্শকের কাছে পৌছতে পারবে কিনা এমন দ্বিধা রয়েছে যেহেতু, প্রদর্শনের উপযুক্ত কাঠামো এখনও ঐ সব মানুষের বাসস্থানের নিকট অঞ্চলে গড়ে ওঠেনি। অর্থাৎ, ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ত্রুটিপূর্ণ প্রদর্শন ব্যবস্থার কারণে তাদের পক্ষে ছবি দেখা সম্ভব হলো না। ছবি যদি প্রকৃত ও নির্দিষ্ট দর্শকের মাঝে প্রদর্শিত হতে পারতো তাহলে হয়ত ছবি চলে না এই অজুহাত ততটা ভিত্তি পেত না। ভিন্ন ধারা ছবির ক্ষেত্রে এই বিষয়টি বাণিজ্যিকভাবে পরিলক্ষিত নয় এখনও। তবুও যা সত্য তা হলো এই ধরনের ছবি যেমন নির্মাণের ক্ষেত্রে তেমনি পরিবেশনার ক্ষেত্রে সহজভাবে পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতে পারে না। তারই অবশ্যম্ভাবীপরিণতি হলো,ধারাবাহিক চলচ্চিত্র চর্চার ক্ষেত্রে বিরতি। এই প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করা সম্ভব হচ্ছে না বলে এখন ভিডিও ফর্মাটে সৃষ্টি কর্মের পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। এরকম প্রচেষ্টার কথা ইদানীং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রায় সব জাতিগোষ্ঠীর মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। সেখানেও পারস্পরিক আদান প্রদানের মাধ্যমে একটা প্রদর্শন ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি। প্রদর্শনী প্রধানতঃ বিশেষ গোষ্ঠী নির্ভর হয়েই এখনও রয়েছে।

প্রদর্শনের এই সমস্যা থেকে বেরুতে হলে উত্তর পূর্বাঞ্চল জুড়ে চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর সমন্বয় গড়ে তোলার কথা চিন্তা করতে হবে। এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ক্রিয়াকান্ডের সঙ্গে জড়িত গোষ্ঠীগুলোর সাহায্যে একটা বিকল্প প্রদর্শনী ব্যবস্থা গড়ে তোলা যেতে পারে। যাদের প্রধান কাজ হবে প্রান্তিক সীমানায় বসবাসকারী মানুষের বাসস্থানের কাছাকাছি এলাকায় অন্য সমাজের জন্য ভিন্ন ধারা, ছবির প্রদর্শনীর আয়োজন করা। এই ধরনের প্রদর্শনীতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের ছবিগুলো প্রদর্শিত এবং আলোচিত হওয়ার ব্যবস্থা হলে একই অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে যে কৃত্রিম ব্যবধান তৈরী হয়েছে তা দূর হতে সাহায্য করবে। অন্য সমাজের জন্য ভিন্ন ছবি বিকশিত হওয়ার জন্য অন্য একটি প্রদর্শন ব্যবস্থার উদ্ভাবন নিয়ে ভাবনা চিন্তার এই তো উপযুক্ত সময়। সৃষ্টি পদ্ধতির উৎকর্ষহীনতার কথা বলে যারা এখানকার আদিবাসী মানুষের জীবন নির্ভর চলচ্চিত্রকে অপাঙক্তেয় বলে মনে করেন তাঁরা একথা ভুলে যান যে শিল্পের মহত্ব তার প্রভাবময়তায়, সৃষ্টি পদ্ধতির উৎকর্ষে নয়। আদিবাসী মানুষের জীবন নির্ভর সাহিত্য, নাটক, টেলিফিল্ম,সিনেমা, ভিডিও এলবাম ইত্যাদি সৃষ্টিমূলক বর্তমান সব ক্রিয়াকান্ডের পেছনে ঐ সব চলচ্চিত্রের প্রভাব যে অনস্বীকার্য তা বলাই বাহুল্য।

ককবরকে নির্মিত
ত্রিপুরার প্রথম কাহিনী চিত্র
লংতরাই

ককবরক ত্রিপুরার আদিবাসীদের মুখের ভাষা। সেই ভাষায় তৈরি লংতরাই বহির্ত্রিপুরার দর্শকদের মধ্যে বিস্ময় জাগিয়েছে। বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়ে চলেছে ১৯৮৬ সনে নির্মিত এই কাহিনী চিত্রটি, যার প্রদর্শকাল ৭৫ মিনিট।

কাহিনী।। বিমল সিংহ
সংলাপ।। বিমল সিংহ এবং
তলবাংহা রিয়াং
চিত্রনাট্য এবং পরিচালনা ।। দীপক ভট্টাচার্য
প্রযোজনা।। নর্থইস্টার্ণ ফিল্মস্
আর্থিক সহায়তা-রেবতী দাস, রতন দত্ত, যমুনা সাহা ও ত্রিপুরা সরকার
চিত্রগ্রাহক—বিজয় আনন্দ সাবের ওয়াল।
শব্দ গ্রহণ—রবীন সেনগুপ্ত।
শব্দ পুনঃসংযোজন-জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়,
অনুপ মুখোপাধ্যায়।
ল্যাবরেটরি—এড্ ল্যাব, মুম্বাই।
সম্পাদনা—রথীশ সাহা।
প্রচার—দীপঙ্কর সাহা।
প্রোডাকসন সহাযতা—অনিল শোরদকর।
ইকুইপমেন্টস— এন.এফ. ডি. সি, কলকাতা।
বাচ্চু মিত্র ।
রাজকমল ষ্টুডিও।
অভিনয় করেছেন ·
জরকামুনি—জীতেন্দ্র রিয়াং
রমকারাই—ভগীরথ রিয়াং
বিদ্যাজয়—যতীন্দ্র রিয়াং
আলরুঙ—আলুবঙ রিযাং
সাজেরুঙ—প্রমীলা রিয়াং
ফাইফ্রঙ—ফাইফ্রঙ রিয়াং
কউরংফা—প্রকারাই রিয়াং
ওচাই—তলবাংহা রিয়াং
দারোগা—তরুণ ভট্টাচার্য্য
ফরেষ্টার— পানু ভট্টাচার্য্য
মহাজন —প্রবীর ভট্টাচার্য্য
ও লকারাই পাড়া, সাতমাইল ও শিকারী বাড়ীর গ্রামবাসীগণ।

দৃশ্য।। এক।।

সময়—ভোর

স্থান—জরকামুনির গ্রাম

লংশটে সূর্যোদয়। লংতরাই উপত্যকার প্যানিং শট থেকে গ্রামের টপ শট। টংঘরের সামনে কুতুই,পাগড়ী পরে জরকা। ক্লোজে-জরকা চীৎকার করে বলছে

—আজকে আমাদের জুমে কাজ হবে, যাদের জুমে আমি কাজ করেছি এবং যারা আমাকে দিয়ে তাদের জুমে কাজ করাতে ইচ্ছুক-তোমরা সবাই এসো।

গ্রামবাসীরা বিভিন্ন টংঘর থেকে বেরিয়ে জরকাসহ গ্রাম থেকে বেরিয়ে যায়।

গ্রামের ভেতর সকালের বিভিন্ন দৃশ্য।

দৃশ্য।। দুই।।

সময়—সকাল

স্থান—জুমের টিলা

জরকাসহ অন্যান্যরা টাক্কল দিয়ে বাঁশ কাটছে। বাঁশ ঝাড়ের ফাঁক দিয়ে জরকা দূরে তাকায়।

দৃশ্য।। তিন।।

সময়—সকাল

স্থান—টঙের সাংসি

সাজেরুং সাংসিতে দাঁড়িয়ে চাল ঝারছে। মাঝে, মাঝে পাশে রাখা ঠপঠপিতে টান দিয়ে পাখী তাড়াচ্ছে। দূরে বাঁশ ঝাড়ের পেছনে জরকার মুখ খুঁজছে।

দৃশ্য।। চার।।

স্থান—জুমের টিলা

সময়—দুপুর

জরকামুনি, তসীরাম, বিদ্যাজয় একটা গাইরিঙের সাংসিতে বসে একটা কাঁঠাল খাচ্ছে। প্রত্যেকে একটা করে করে কোয়া নিয়েছে।

তসীরাম—নতুন জুম ভালই হবে।

জরকা কাঁঠালের কোয়া নিয়ে ওর দিকে তাকায়।

তসী—অচেনা পাহাড় থেকে এক নতুন পাখী এসেছে।

বিদ্যাজয় কাঁঠাল খেতে খেতে বলে-সত্যি, যদিও নতুন তবু জরকার কাছে মনে হয় অনেক পরিচিত।

জরকা লাজুক হেসে ওদের বলে-স্বীকার করতেই হয় সে সুন্দরী, কিন্তু পোষ মানবে কি?

বিদ্যাজয় পাতা মুড়ে হাতে নিয়ে বলে—কেন নয় ? বন্য, হিংস্র হাতীকে পোষ মানানো যায় আর এই ছোট্ট পাখীকে বাঁধতে পারবে না?

তসীরাম কাঁঠাল নিয়ে উঠার উপক্রম করে—ওসব ছাড়ো—ওকে বাঁধার জন্য এখন থেকে লেগে পরো।

জরকা লাজুক হাসে। ওরা ফ্রেম আউট হয়ে যায়।

দৃশ্য।।পাঁচ

স্থান—ছড়ার পার।

সময়—বিকেল

জরকামুনি, বিদ্যাজয় ও তসীরাম কাজের শেষে ছড়ার জলে হাতমুখ ধুচ্ছে। পিছনে খাড়া নিয়ে সাজেরুং, পন্দীরুং ও অন্যান্য মেয়েরা এসে দাঁড়ায় ছড়ার অপর পারে। মেয়েরা তাদের জিনিষ পারে রেখে ছেলেদের দেখে। ওয়াইসরুং ওদের অনুরোধ করে-তোমরা এ ঘাটে এসেছো কেন? অন্য ঘাটে যাও না।

জরকা ও বিদ্যাজয় মুখ ধুতে থাকে। বিদ্যাজয় মুখ টিপে হাসে। সাজেরুং এগিয়ে এসে বলে — তোমরা কি মেয়েদের স্নান দেখতে চাও?

বিদ্যাজয় দাঁড়িয়ে বলে-তোমরা স্নান করো-আমরা মুখ ফিরিয়ে থাকবো।

জরকামুনি আঁজলা ভরে জল তুলেছিল মুখে দেবার জন্য। সাজেরুঙের কথা শুনে সে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। সাজেরুঙও ওকে লক্ষ্য করে তাকায়। বিদ্যাজয় উভয়কে দেখে একটা মৃদু ধাক্কা দেয়—জরকা চমকে বলে-চল, চল মেয়েরা এখন স্নান করবে।

বিদ্যাজয় অবাক হয়ে দেখে—ধীরে, ধীরে উঠে যায়। মেয়েরা জলে নামে, জল ভরে।

দৃশ্য।। ছয়

স্থান—সাংসি

সময়—বিকেল

সূর্যাস্তের আভা জরকার মুখে। সে নিবিষ্ট মনে বাঁশী বাজাচ্ছে।

দৃশ্য।। ছয় (ক)

স্থান—গ্রামের অভ্যন্তর

সময়—বিকেল

প্রকৃতির প্যানিং শট। একজন মহিলা কাঠের বোঝা নিয়ে ফিরছেন। বাচ্চারা খেলছে। গাছে ঝুলছে গ্রাম্য ছেলে।

দৃশ্য।। সাত

স্থান—ছড়ার পার

সময়—বিকেল

জল ভরে মেয়েরা এক এক করে ছড়া থেকে বেরিয়ে আসে। (মেয়েদের কলকাকলির সঙ্গে বাঁশীর সুর মিশে যায়)

দৃশ্য।। সাত (ক)

স্থান—গ্রামের পথ

সময়—বিকেল

মেয়েরা এক এক করে পেছনে জল ভর্তি ঘড়া নিয়ে গ্রামে ঢোকে। সাজেরুঙ একটু আনমনাভাবে এগিয়ে চলে। জরকা বাঁশী বাজিয়ে চলে আপনমনে। ওর দিকে তাকিয়ে, বাঁশি শুনে সাজেরুঙ দাঁড়িয়ে যায়। পেছন থেকে ওয়াইসেরুঙ এসে মৃদু ধাক্কা দেয়।

ওয়াইসেরুঙ—দাঁড়িয়ে পরলে যে।

মল, গহনা এবং কথায় চমক ভাঙ্গে জরকার, বাঁশী থেমে যায়, তাকায় ওদের দিকে। সাজেরুঙ লজ্জা পায়, ওয়াইসেরুংকে উদ্দেশ্য করে বলে—বাঁশীর সুর চলার কথা ভুলিয়ে দেয়। সাজেরুঙ চলে যায়। জরকা ওদের দিকে তাকিয়ে থাকে। সূর্য অস্ত যাচ্ছে।

দৃশ্য।। আট

স্থান—দোয়াইনকের ভিতর

সময়—সন্ধ্যা।

বেশ কিছু যুবক বিভিন্ন হাতের কাজ করছে, এদের মধ্যে বিদ্যাজয়, তসীরাম ও জরকা রয়েছে। বিদ্যাজয় বেতের একট ঝুরি বানাচ্ছে। জরকা একটা বাঁশের চিরুণী বানাচ্ছে—তসীরাম সেন্দ্রা তৈরী করছে। হাত চলছে সংগে তসীর মুখও।

তসীরাম—কি হলো-এত সুন্দর বাঁশীটা বন্ধ করলে কেন? তোমায় কি পিপড়ে কামরেছে?

বিদ্যাজয়—মনের পিপড়ে কামড়েছে।

জরকা মনোযোগ দিয়ে চিরুণীটা বানাচ্ছে। তবুও একবার ওদের দিকে তাকায়। চিরুণীটা দেখিয়ে তসীরাম বলে—এমন সুন্দর চিরুণী-কোন ভাগ্যবতীয় মাথায় যাবে কে জানে-

বিদ্যাজয়—পাতাল খুঁড়েও যেমন চান্দমামার শিকড়ের হদিস পাওয়া যায় না।

তেমনি জরকামুনির মনের হদিশও পাওয়া যায় না।

জরকা হাসিমুখে চিরুণী থেকে মুখ তুলে তাকায়।

বিদ্যাজয়—তবে মনে হয় খমুপাড়া পাহাড়ের পাখী যেমন উড়ে তেমনি তার মনটাও উড়ে। সবাই হেসে ওঠে।

দৃশ্য।। নয়

স্থান—সাজেরুঙ এর মাসীর টঙ

সময়—রাত্রি

কাঠের আগুনের পাশে বসে সাজেরুঙ ও মাসী। মাসী চক্‌ক্ষি দিয়ে কার্পাসের বিচি ছাড়ায়। সাজেরুঙ আনমনাভাবে কার্পাস নাড়াচাড়া করছে। মাসী সাজেরুঙকে বলে—

মাসী—কিরে আগুন যে নিভে গেল। লাকড়ি দে।

চমকে সাজেরুঙ আগুনের দিকে তাকায়-ধীরে, ধীরে বাইরে চলে যায় সাংসিতে এসে ছেলেদের গান শুনতে পায়, জ্যোৎস্না রাতে সে গান শোনে দাঁড়িয়ে।

দৃশ্য।। নয় (ক)

স্থান—দোয়াইনকের অভ্যন্তর

সময়—রাত

জরকামুনি, বিদ্যাজয়রা নেচে নেচে গান করছে।

নউখা, পিলালা সাংসিওয়ালা লা

ফাইদি—ফেরাই লাই—তুংনা

কাতি খামানি তৈয়ারী মাইরাং

তক্ তুইউ হা তোই তাম ফাই হো।।

কাতি খামানি শুকাম ব কিতিং
দরমো তপন সউঅ।
কাতি খামানি শুকাম ব ক্লাউ
দরমো চকা শৌ অ।

জ্যোৎস্না রাত, মেঘমুক্ত আকাশ
এসো আমরা বেড়াই,
ছড়ার ঘাটের নীচের দিকে তিনটি ডিম ঘুরছে
ঘাটের নীচের দিকে গোল শামুকটি
ধার্মিক তপস্বীর মত দেখতে
ঘাটের নীচে লম্বা শামুক
ধর্মের চরকার মত দেখতে
এসো আমরা বেড়াই।

দৃশ্য।। নয় (খ)

স্থান—টঙ এর বাহির।

সময়—রাত।

জ্যোৎস্না রাত। সাজেরুঙ লাকড়ি নিতে এসে গান শুনছে দাঁড়িয়ে। মাসির কথা গানের ওপর শোনা যাবে।

মাসি—অন্ধকারে তুলা ধুনতে পারি না। তাড়াতাড়ি আয়।

সাজেরুঙ বিরক্ত হয়ে লাকড়ি নিতে থাকে। মাসি আবার ভেতর থেকে বলে ওঠে।

মাসি—এত উতলা হওয়া ভালো নয়।

সাজেরুঙ লাকড়ি নিয়ে ঘরে ঢোকে।

সাজেরুঙ—আমি উতলা হইনি। অন্যের মতও নই।

বলতে বলতে লাকড়িগুলো রাখে ও একটা লাকড়ি উনুনে গুঁজে দেয়। মাসী কাজ করতে করতে বলে।

মাসী-হ্যা, হ্যা সুন্দর গান আমি ও ঘর থেকে শুনছি।

উনুনের কাছ থেকে সাজেরুঙ মাসীর দিকে তাকায় ও জবাব দেয়।

—মাসী এমন বলো না।

মাসী তুলা ধুনতে থাকে। মুখে মুচকি হাসি। জ্যোৎস্নায় আলোকিত প্রকৃতি। চাঁদ।

দৃশ্য।। দশ

স্থান—ছনক্ষেত ও নিকটবর্তী ঢালু জমি।

সময়—বিকেল।

ছন ক্ষেতে লোকেরা কাজ করছে। ক্যামেরা লঙ শট থেকে প্যান করে বিদ্যাজয়, তসীরাম হয়ে জরকার উপর স্থির হয়। জরকা ছন কেটে আঁটি বাঁধছিল। এদিক ওদিক তাকিয়ে সাজেরুঙ, ওয়াইসেরুঙ পন্দীরুঙদের দেখতে পায়। সে ডানদিকে বেরিয়ে যায়। সাজেরুঙ

ওকে **দেখতে পেয়ে** বন্ধুদের বলে—

সাজেরুঙ—আমায় আরো পাতা নিতে হবে। তোরা যা।

ওয়াইসেরুঙ বুঝতে পেরে—তোরা চল্। সাজেরুঙের অপেক্ষা করে লাভ নেই। চল যাই। ওপরে দাঁড়িয়ে জরকা। **দেখতে পেয়ে** গন্দীরুঙ বলে—

হ্যা, হ্যা, চল।

ওরা হাসতে হাসতে চলে যায়। জরকা নেমে সাজেরুঙের পাশে দাঁড়ায়।

জরকা—আমার কাছে অনেক পাতা আছে। দেব তোমায় ?

সাজেরুঙ সলজ্জভাবে—না, না।

জরকা ওকে ধরে গাছতলায় বসে। কাপড়ের খুঁট থেকে বাঁশের চিরুণীটা বের করে তাকায় সাজেরুঙের দিকে, হাত বাড়িয়ে দিতে যায়।

সাজেরুঙ—যেখানে থাকবে বলে বানিয়েছ, সেখানেই দিয়ে দাও। বলে ঘাড় ঘুরিয়ে বসে । জরকামুনি নিচু হয়ে ধীরে ধীরে খোঁপায় চিরুণীটা পরিয়ে দেয়। সাজেরুঙ হাত দিয়ে খোঁপাটা দেখতে গিয়ে জরকার হাত ধরে, দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে থাকে।

সাজেরুঙ—আজকের এই সুন্দর পাহাড়, জল কত মনোরম, বনের পাতা, আলু খেয়েও এখানে থাকতে কত সুখ। এই সুন্দর জগৎ ছেড়ে যাওয়াটা আমার কাছে স্বপ্ন মনে হয়।

জরকা—কোনদিন তোমার চোখে জল দেখিনি। কি হয়েছে আজ তোমার ?

সাজেরুঙ দাঁড়ায়। হাত ধরা থাকে জরকার

সাজেরুঙ—কাল এখান থেকে চলে যাব। বাড়ীতেও অনেক কাজ রয়েছে। এত দেখাদেখি, সাক্ষাৎ সব কিছুর বিচ্ছেদ হবে আজ।

শিশির ভেজা বাঁশ ছুলেই যেমন টুপটাপ শিশির ঝরে তেমনি যাবো যাবো করেও যেতে পারি না চোখের জলে—

এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে সাজেরুঙ চলে যায় নীচের দিকে। জরকা তার যাওয়ার পথে তাকিয়ে থাকে। সাজেরুঙ পাহাড়ের বাঁকে চলে যায়।

বুসাক বাই বুসাক

(আবহ সংগীত)

বিদেশী উঙ—ফ
খাপাঙ লে বিদেশী
তা উঙদি।

আমরা যদিও দুই গ্রামে থাকি।
তবুও মনের দিক থেকে
আমরা যেন এক থাকি।

দৃশ্য।। এগার

স্থান—বাজার মহাজনের গদী

সময়—দুপুর।

জমজমাট বাজার। ট্রাক থেকে মানুষ নামছে। মহাজনের গদীর বাইরে ওজন হচ্ছে। জরকা ও তার বাবা আরো অনেকের সংগে কার্পাস নিয়ে অপেক্ষা করছে। অন্য এক রিয়াং দম্পতির জিনিষ ওজন হয়েছে। মহাজন তাকে উদেশ্য করে বলে-

মহাজন—তুমি একশ রূপাইয়া লাকাই নিয়েছিলে। এখন সুদ আসল মিলাইয়া হইছে দেড়শ রূপাইয়া। তোমার স্পিং আউর খুলের দাম হইছে একশ রুপাইয়া।

তারপর ক্যাশ বাক্স খুলে দুটো রূপার মালা বের করে।

—এই দুইটা রামবাক তোমার আছে। একটা নিয়ে যাও। বাকী রামবাক নিতে পারবে পঞ্চাশ রূপেয়া দিতে পারলে।

রিয়াং স্বামী একটা মালা হাতে নেয়। হাত জোড় করে বলে—

—বাবু না খেয়ে মারা যাবো।

মহাজন হাত নেড়ে বলে—ভাগো আভি যাও। উসকা বাদ কৌন?

—উসকা বাদ হামি আছে। বলতে বলতে দারোগা ঢোকে। ওকে দেখেই মহাজন হাতজোড় করে—আরে দারোগাসাব। আইয়ে, অন্দর চলিয়ে। ওরা চলে যায়। জরকা ও তার বাবা শূন্য গদিতে প্রতীক্ষা করে। তাদের সামনে দিয়ে মহাজনের কর্মচারী মিষ্টি নিয়ে যায়। ওরা প্রতীক্ষা করে থাকে। কিছুক্ষণ পরে মহাজন ও দারোগা বেরিয়ে আসে। দরজায় দাঁড়িয়ে দারোগা ওকে আশ্বস্ত করে।

দারোগা—আপনার চিন্তার কোন কারণ নেই। সব আগের মতই চলবে।

মহাজন—সব আপকি মেহেরবানী।

দারোগা চলে গেলে মহাজন গদীতে বসে কর্মচারীকে জিজ্ঞেস করে।

মহাজন—কিতনা হুয়া?

কর্মচারী দাঁড়িপাল্লার ওজন দেখে জবাব দেয়।

—পৌনে এক মণ।

জরকা—সেকি? এখানে একমণ হওয়ার কথা।

বাটখারার সঙ্গে ভাঙ্গা ইটের টুকরো দেখিয়ে জানতে চায়-

—ওটা কি?

মহাজন—ওটা ফের ভাঙতে লাগে ।

মহাজন হিসাবের খাতা উল্টে পড়তে থাকে।

—এখানে একশ রূপাইয়া লাকাই। আভি হইছে একশ বিশ রূপাইয়া ।

রংকারাই হাতজোড় করে উঠে দাঁড়ায়। মহাজন আড়চোখে দেখে বলে ওঠে—সুদ কোথায় গেল রে রংকা। এখন যা পরে দেখা যাবে।

জরকা রাগতস্বরে বাবাকে বলে—বাবা আমরা ঠকছি।

বাবা ওর হাত ধরে বেরিয়ে যেতে যেতে বলে-

ঠান্ডা হও বাবা,শান্ত হও।

এরা বাজারের ভিড়ে মিশে যায়।

বাজারের বিভিন্ন দৃশ্য

দৃশ্য।। বারো

স্থান—টঙের অভ্যন্তর।

সময়—রাত

উনুনে ভাত হচ্ছে। জরকার মা ভাত রান্না করছে। ঘরের এককোণে জরকা গোঁজ হয়ে বসে অন্যদিকে রংকারাই হুঁকা টানছে।

মা—খাওয়ার জন্য কিছু আন নি?

রংকারাই—আনি নি, ঋণ শোধ করে আনতে পারি নি।

জরকা—ওজনেও ঠকায়, হিসেবেও ঠকে যাই। তোমরা মেয়েরা কি বুঝবে?

মা—অন্য লোকেরাও ঋণ নিয়ে খায়।

রংকারাই রেগে বলে—তুমি শুধু গিলতেই জানো, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় মাসে যখন বন আলু, বাঁশের করুল মিলেনি, কুণ্ডা আলুও ছিল না তখনই তো ঋণে ডুবতে হয়েছে। বাজার থেকে সৌদা আনতে পারিনি বলে কত কটূ কথা যে বলছ—

এমন সময় বিদ্যাজয় দরজায় এসে দাঁড়ায়। ওদের কথা শুনে একটু হাসে। ঢুকে দরজার পাশে বসে—রংকারাইর হাত থেকে হুঁকা নেয়।

বিদ্যাজয়—ও জ্যাঠা তোমরা থামো। একটা জরুরী কাজে এসেছি। এই জরকা যা তো একটু বাইরে যা।

জরকা বেরিয়ে যাওয়ার পর, হুঁকায় দু'টা টান দিয়ে সে আবার বলে—এবার জরকার একটা বিয়ে দাও।

মা—আমি আর পারি না, এখন বিয়ে হলে বাঁচি—কিন্তু মেয়ে কই?

বিদ্যাজয়—খমুপাড়ার মেয়েটা যার ঠোঁট লাল, রঙও ফর্সা কাজেও ভালো ওর সঙ্গে মানানসই হবে। তোমাদের পছন্দ হবে কিনা জানি না।

রংকারাই—তুমি যখন এত ভাল বলছ, তখন দেখা যেতেই পারে।

দৃশ্য—তেরো

স্থান—বিভিন্ন

সময়—সকাল

রংকারাই, তাঁর স্ত্রী, তসীরাম ও বিদ্যাজয়, হাতে বল্লম নিয়ে বিভিন্ন জায়গা দিয়ে চলেছে। ওদের পোষাক বিশেষ কোন আচার, অনুষ্ঠানের উপযুক্ত।

দৃশ্য।। চৌদ্দ

স্থান—সাজেরুঙের বাড়ীর বাইরে/টঙের ভেতর।

সময়—সকাল

সাজেরুঙ সাংসিতে বসে তাঁত বুনছে। হঠাৎ দেখতে পায় রংকারাইদের। ওদের দেখেই সে উঠে ভেতরে চলে যায়। ভেতর থেকে তার বাবা বেরিয়ে এসে সাংসি পরিষ্কার করে অতিথিদের উদ্দেশ্যে বলে—

কউরাংফা—আসুন হাত পা ধুয়ে এসে বসুন।

ওরা সাংসিতে ওঠে বসে।

রংকারাই—আমাদের সঙ্গে আপনার যদি সম্বন্ধ করতে আপত্তি না থাকে তাহলে কথাবার্তা বলা যেতে পারে।

কউরাংফা—এসব কথা এখানে নয়। চলুন ভিতরে চলুন।

ওরা সবাই ঘরে ঢুকে যায়।

এক এক করে বসে।

কউরাংফা—বউ, ওরা হেঁটে এসে ক্লান্ত, ঘরে যতটুকু মদ আছে এদের দাও। কউরাংফার স্ত্রী একটি তুইলাউ ওদের সামনে রাখে। রংকারাই ওর সঙ্গের ছেলেদের বলে-

—তোমরা বাঁশের চোঙগুলো নিয়ে এসো।

কউরাংফা—না থাক্, চোঙ আনার দরকার নেই। বউ তুমি একবার চৌধুরীকে ডেকে আনো।

কউরাংফার স্ত্রী বেরিয়ে যায়।

ওরা হুঁকা টানতে থাকে। একটু পরেই চৌধুরীকে নিয়ে সাজেরুঙের মা চলে আসে। তসীরাম ও বিদ্যাজয় ওদের প্রণাম করে বাঁশের চোঙের আনা মদ নিবেদন করে। ওরা মদ গ্রহণ করে।

সাজেরুঙের মা—মেয়েটা অসম্ভব অলস। কোন কাজেরই না। দেখতেও ভালো না।

ক্ষারপানি দিতে বললে অন্য কিছু দেয়। শুধু গায়ের রঙটাই যা ফর্সা।

জরকার মা—আমাদের বংশের সঙ্গে আপনাদের বংশের বৈবাহিক সম্বন্ধে ঘটে থাকে। এদের এই কথাবার্তার মধ্যে বিদ্যাজয় ও তসীরাম উঠে পড়ে। ওরা বাইরে যায় ও তাঁতের কাপড় পরীক্ষা করে। বাড়ীর অন্যান্য হাতে তৈরী জিনিষের মান পরীক্ষা করতে থাকে।

কউরাংফা—আমার অবস্থা খুবই খারাপ আপনারা বিবেচনা করুন।

রংকারাই—আমিও ফকির তুমিও ফকির। দা কিনলে লবণ কিনতে পারি না।

চৌধুরী—ভালোই হয়েছে। তোমাদের অবস্থা একই। সম্বন্ধ পাকা করে ফেলো।

কউরাংফা—আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু—

রংকারাই—আর কোন কিন্তু নেই। সম্বন্ধটা পাকা হলো—

চৌধুরী—তবে খরচ নিয়ে তোমাদের মধ্যে আলোচনা করে নিও।

কউরাংফা—দুটো শুয়োর আর কিছু মদ নিয়ে এলে আমার সুবিধা হবে। এছাড়া আর কিছু বলার নেই।

সমস্ত কথাবার্তা সাজেরুঙ পেছনের সাংসিতে দাঁড়িয়ে শুনেছে।

দৃশ্য।। পনেরো

স্থান—টঙের ভেতর

সময়—রাত

সাজেরুঙের বক্ষবন্ধনীর সঙ্গে জরকার বিয়ে। ওচাই মন্ত্র পড়ে সবার সম্মতি নিয়ে

বিয়ে দেয়। বাইরে অতিথিরা মদ পান করে ও নাচের আনন্দ উপভোগ করে ।

(হজাগিরি নৃত্য)

দৃশ্য ।। ষোল

স্থান—টঙের ভেতর

সময়—ভোর

ঘরের ভেতর জরকা ও সাজেরুঙ ঘুমিয়ে আছে। ভোরবেলা মোরগের ডাকে ঘুম ভাঙ্গে সাজেরুঙের। সে আলতোভাবে ধাক্কা দেয় জরকাকে।

সাজে—এই ওঠ। ভোর হয়ে গেছে।

জরকা ধীরে ধীরে চোখ খুলে তাকায় সাজেরুঙের মুখে। তারপর সমস্ত ঘরটা দেখে। উঠে বসে।

জরকা—হ্যা, আজ থেকে তোমরাই তো আমার সব।

দৃশ্য ।। সতের

স্থান—টঙের বাইরে। বিভিন্ন সময়।

সময়—সকাল, মধ্যাহ্ন।

সাজেরুঙ ও জরকা দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ায়। সাজেরুঙ ওর হাতে ঝাড়ু ধরিয়ে দিয়ে যায়। জরকা উঠান ঝাড়ু দিয়ে শুকনো পাতা সব জড়ো করে আগুন দেয়। শ্বশুড়কে হাতমুখ ধোওয়ার জল এগিয়ে দিয়ে তাঁর জন্য হুঁকা সাজিয়ে আনে। সাজেরুং শুয়োরের খাওয়ার দেয়। জরকা তুলা পরিষ্কার করে। লাকড়ি কাটে। ঘর ছাউনি দেয়ার জন্য জরকা ওপরে ওঠে ও সাজেরুঙ ওকে ছন নীচ থেকে ছুঁড়ে দেয়। কাজের ফাঁকে দু'জন পাহাড়ের কোলে নিরিবিলি বসে। হাতে হাত রেখে পাশাপাশি হেঁটে বেড়ায়। (মনতাজ সাজানো হয়েছে, আবহে বাঁশী)

দৃশ্য ।। আঠারো

স্থান—উঠান

সময়—মধ্যহ্ন।

জরকামুনি ও সাজেরুঙ সাংসির নীচে দাঁড়িয়ে ধান ভাঙছে। এমন সময় সাজেরুঙের মা হুঁকা হাতে করে ঘর থেকে বেরিয়ে সাংসিতে এসে বসে। হুঁকায় কয়েকটা টান মেরে জরকাকে বলে — শাশুড়ী—যাওনা বুড়োটাকে নিয়ে এসো।

জরকা—না। আমি পারব না। আমি কি চুপ করে আছি?

শাশুড়ী—তা যাবে কেন? পরের ছেলে তো কি বুঝবে? শুধু খেতেই জানো কোন কাজের না।

জরকা ধান ভাঙ্গা বন্ধ করে। সাজেরুঙ উভয়কে লক্ষ্য করে।

জরকা—মাতাল হয়ে পরে আছে—তাঁকে তুলে আনতে হবে। কোন্ কাজটা তোমরা কর। সবই তো আমাকে করতে হয়। তা সত্ত্বেও কোন কাজ তোমাদের পছন্দ হয় না।

সাজেরুঙ করুণ মুখে বলে।

সাজে—বাবা বুড়ো মানুষ তুমি না গেলে কি করে আসবেন, ঘরে আর কেউ নেই-

তাছাড়া তুমিই ত অস্থি বিসর্জনের উত্তরাধিকারী।

জরকা—আমি তো কোন কাজেরই না, একটা অপদার্থ। আবার এই আমি ছাড়াও পথ নেই।

জোরে যাতাটা ঠুকে বেরিয়ে যায়। ওর যাওয়া দেখে সাজেরুঙ ও তার মা।

দৃশ্য আঠারো।

স্থান—গ্রাম্য রাস্তা

সময়—দুপুর।

রাস্তার পাশে মাতাল কউরাংফা পরে আছে। বমিও করেছে। একটা কুকুর তার মুখের কাছে ঘুরছে। মাঝে, ম্যাঝে সে নাম ধরে ডাকছে।

—রাঙা জামাই, রাঙা জামাই।

দৃশ্য।। আঠারো(ক)

স্থান—গ্রামের ভেতর

সময়—দুপুর

জরকা এসে একটা বাড়ীর সামনে দাঁড়ায় সেখানে দু'জন যুবক একটা ঝুড়ি বানাচ্ছে।

জরকা—শ্বশুর রাস্তায় পড়ে আছে। আমার সঙ্গে চলো।

ওরা সবাই মিলে জরকার শ্বশুরকে কাঁধে করে ঘরে নিয়ে আসে। সাংসিতে শ্বশুরকে বসিয়ে জরকা এক কোণায় দাঁড়িয়ে থাকে। তার বন্ধুরা ইতস্তত বসে থাকে।

দৃশ্য।। উনিশ

স্থান—সাংসি

সময়—প্রায় বিকেল

কউরাংফা ঘরের ভেতর তাকিয়ে জরানো গলায় বলে।

কউরাংফা—বৌ। অ বৌ একটু মদ দে। আজ রাঙা জামাইর সঙ্গে মদ খাবো।

সে ইসারায় জরকাকে ডাকে। বৌ একটা তুইলাউ ভর্তি মদ দিয়ে যায়। সাজেরুঙ জল এনে দেয়। জরকা এসে প্রণাম করে শ্বশুর ও শাশুরীকে মদ নিবেদন করে। ওরা স্ট্রুতে মুখ দিয়ে মদ টানতে থাকে। দু' এক টান মেরেই কউরাংফার নেশা চাগাড় দিয়ে ওঠে। সে জরকার বন্ধুদের ভেতর থেকে বাঁশী আর ঢোল আনতে বলে। ওরা ঢোল নিয়ে এসে বাজাতে শুরু করে। বাজনার তালে কউরাংফা কোমর দোলাতে শুরু করে। ইশারায় জরকাকে সঙ্গ দিতে বলে। ওর স্ত্রী ধীরে, ধীরে নাচে অংশ নেয়। কউরাংফা বাঁশি বাজাতে শুরু করে। সাজেরুঙও জরকা নাচ শুরু করে। সমস্ত পরিবার বাজনার তালে নাচে মেতে ওঠে।

দৃশ্য।। কুড়ি

স্থান—টিলায় পরিত্যক্ত টঙ।

সময়—দুপুর

গাছপালাহীন টিলায় পরিত্যক্ত টঙের বারান্দায় জরকা ও তার বন্ধু বসে। খরায় মাটি ফেটে আছে। শুকনো গাছ।

বন্ধু—এখনও বৃষ্টি নেই। কি যে হবে এবার -

জরকা আকাশের দিকে তাকায়। মেঘহীন আকাশ দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

বন্ধু—গতবারও ফসল ভালো হয়নি এবারও একই অবস্থা। (আবহসংগীত)

দৃশ্য।। একুশ

স্থান—টঙ এর ভেতর।

সময়—দুপুর

সাজেরুঙ প্রসব বেদনায় ছটফট করছে। শিয়রে তার মা বসে মাথায় হাত বুলাচ্ছে। ধাই শরীরে হাত বুলায়।

ধাই—আমার সাধ্যমত চেষ্টা করেও প্রসব করানো যাচ্ছে না। ওচাই ডাকো।

(গোঙানির আওয়াজ)

দৃশ্য।। একুশ (ক)

স্থান—সাংসি

সময়—দুপুর

কউরাংফা গালে হাত দিয়ে বসে। তার সামনে একটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে।

কউরাংফা—রাঙা জামাইকে ডেকে নিয়ে এসো। সাজেরুঙের অবস্থা ভালো নয়।

(গোঙানির আওয়াজ)

ছেলেটি ফ্রেমআউট হয়ে যায়।

দৃশ্য।। বাইশ

স্থান—টিলা ও পরিত্যক্ত ঘর।

সময়—দুপুর

জরকা ও তার বন্ধু বসে আছে। সেই ছেলেটি দৌড়ে এসে দাঁড়িয়ে বলে -

—তুমি এক্ষুনি বাড়ী যাও। দিদির শরীর খারাপ।

জরকা মুহূর্তে উঠে দাঁড়ায় ও দৌড়ে বেরিয়ে যায়।

দৃশ্য।। তেইশ

স্থান—উঠান

সময়—দুপুর।

কউরাংফা একইভাবে সাংসিতে বসে রয়েছে। জরকা দৌড়ে ঢোকে। জরকাকে দেখে কউরাংফা এগিয়ে এসে বলে-রাঙা, এক্ষুনি তলবাংহা ওচাইকে নিয়ে এসো। একটু দাঁড়াও,

কউরাংকা দ্রুত টঙ এর ভেতর ঢুকে যায়। জরকা গুটি গুটি পায়ে সিঁড়ির কাছে এগিয়ে যায়। কউরাংফা ভেতর থেকে একটা রূপার হার নিয়ে সাংসিতে এসে সেটা জরকার হাতে দেয়।

—এটা বাধা দিয়ে পূজার উপাচারসহ ওচাইকে তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো।

জরকামুনি হারটা নিয়ে শ্বশুরের দিকে তাকিয়ে বলে-

—আপনার শেষ সম্বলটাও দিলেন বাবা।

(সাজেরুঙ চীৎকার দেয়)

কউরাংফা—আঃ দেরী করো না, ফসল ভালো হলে আবার হবে।

টঙ এর দরজায় সাজেরুঙের মা এসে দাঁড়ায়।

—এখনও ওচাই ডাকতে যাওনি? মেয়েটা যে কষ্ট পাচ্ছে।

(গোঙানি)

জরকা হারটা হাতের মুঠোয় চেপে ধরে। ওদের দিকে তাকায়। এবার দৌড়ে উঠান পার হয়ে নেমে যায়।

সাজেরুঙ ব্যথায় ছটফট করছে।

দৃশ্য।। চব্বিশ

স্থান—গ্রামের পথ ও উঠান

সময়—অপরাহ্ন

জরকার বন্ধুটি এক হাতে শুয়োরের বাচ্চা ও অন্যহাতে মুরগী নিয়ে দৌড়ে চলেছে। তার পেছনে জরকামুনি তলবাংহা ওচাইকে ধরে চলেছে। ওরা উঠানে এসে ঢুকে। ওদেরকে দেখে কউরাংফা ব্যস্ত হয়ে ডাকে—

—ওচাই এদিকে আসুন, তাড়াতাড়ি।

কউরাংফা ওচাইকে ঘরে ঢুকিয়ে দেয়। জরকারা নীচে দাঁড়িয়ে থাকে।

(গোঙানির আওয়াজ)

দৃশ্য।। পঁচিশ

স্থান—টঙের ভেতর।

সময়—-অপরাহ্ন

সাজেরুঙ ব্যথায় ছটফট করছে। ওচাই ঘরে ঢোকে। সাজেরুঙের কাছে বসে সে সবাইকে বেরিয়ে যেতে বলে। সবাই চলে গেলে সে সাজেরুঙকে জিজ্ঞেস করে —

ওচাই—কোথায় ব্যথা হচ্ছে বেশী-

সাজে—তলপেটে বেশী ব্যথা হচ্ছে।

ওচাই নীচু হয়ে সাজেরুঙের পেটে হাত বুলাতে থাকে-ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে-সাত দিনের মধ্যে কোন দুঃস্বপ্ন দেখেছো।?

সাজেরুঙ না অর্থে মাথা নেড়ে জবাব দেয়।

ওচাই চিন্তিত মুখে মাথা নাড়ে কিন্তু হাত বুলিয়ে যেতেই থাকে।

ওচাই—এ অবস্থায় টক ফল খেয়েছো?

সাজেরুঙ হ্যাঁ অর্থে মাথা নাড়ে ও অস্ফুটস্বরে বলে-

সাজেরুঙ—খৈচাং।

ওচাই কারণটা ধরতে পারার হাসি হেসে ধাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলে-

ওচাই—তাই তো নাড়ীতে আটকে গেছে। একটু কষ্ট পাবে। সব ঠিক করে দেবো।

(সাজেরুঙের ব্যথা চলবে, সঙ্গে গোঙানি)

দৃশ্য।। ছাব্বিশ

স্থান—নদীর পার ।

সময়—অপরাহ্ণ

এক হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে ওচাই মুরগী কাটছে। জলের মধ্যে এক টুকরো কচি বাঁশ দেবতার আকৃতি অর্থে গেঁথে রাখা। জরকা ও শ্বশুর জলের কাছে বসে ওচাইয়ের কাজ দেখছে। ওচাই মুরগীর ভেতর থেকে নাড়ী বের করে নিবিষ্ট মনে দেখছে। কউরাংকা ব্যস্তভাবে জানতে চায়।

কউরাংফা —ওচাই—কি বুঝছ ?

ওচাই-এটার নীচের দিক পরিষ্কার হলে মেয়ে ওপর দিকে ছেলে-

কউরাংফা—আমাদের কি হবে ?

ওচাই—খবর ভালই। ভোরের দিকে মেয়ে হবে তোমাদের।

(ওচাইর মন্ত্র । স্বাভাবিক শব্দ)

দৃশ্য।। সাতাশ

স্থান—টঙ

সময়—ভোর

সূর্য উদয়। সাংসিতে জরকা, কউরাংফা ও ওচাই বসে। সবাই চিন্তিত। এমন সময় ধাই দরজা খুলে বেরিয়ে এসে জানায়—

ধাই—ছেলে হয়েছে। (বাচ্চা কান্নার শব্দ)

জরকামুনি একবার ধাইয়ের দিকে তারপর শ্বশুর ও ওচাইর দিকে তাকায়, তারপর ধীরে, ধীরে উঠে দরজার কাছে যায়। দরজা থেকে সাজেরুঙ ও শিশুকে দেখে। আস্তে ঘরে ঢোকে। সাজেরুঙের পাশে বসে ওর মাথায় হাত দেয়।

জরকা—খুশী তো ?

সাজেরুঙ ম্লানমুখে হাসে। জরকা এবার শিশুটিকে দেখে।

দৃশ্য।। আটাশ

স্থান—সাংসি, টঙের ভেতর

সময়—সকাল

গ্রামবাসীরা ওচাই, কউরাংফা, তার স্ত্রীসহ বসে কথা বলছে। বাঁশের হুঁকা হাতে হাতে ঘুরছে। ধাই ভেতরে সাজেরুঙের পেটে মাটির ঢেলা গরম করে সেঁক দিচ্ছে। বাচ্চা ঘুমিয়ে আছে তার পাশে। বাইরের কথা ধাই শুনছে। চৌধুরী হুঁকায় টান মেরে বলে ওঠে —

চৌধুরী—বিষ্ণুরাম কেমন নাম ?

কউরাংফা—জন্মেজয় হলে কেমন হয়।

কউরাংফার স্ত্রী—বড় কষ্ট হয়েছে ছেলে জন্মাতে। কষ্টরাই হলে ভালো মানাবে। দরজা দিয়ে ধাই হাতে মাটির ঢেলা নিয়ে বেরিয়ে এসে বলে—

ধাই—রূপার হার বন্ধক দিতে হয়েছে, তাই এর নাম হবে রূপাহারা (রাংথাংকা)

ওচাই—সঠিক নাম।

বাকীরা সম্মতিসূচক শব্দ করে। (হুঁকার আওয়াজ ও আনুসঙ্গিক শব্দ)

দৃশ্য।। উনত্রিশ

স্থান—সাংসি, উঠান

সময়—সকাল

শিশু কোলে সাজেরুঙ সাংসিতে গ্রামবাসীর মাঝে বসে আছে। জরকা নীচে ওচাইর ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করছে। পুরুষ গ্রামবাসীরা চারদিকে দাঁড়িয়ে আছে। বয়স্করা কেউ হুঁকা টানছে। মায়েদের কোলে বাচ্চা। ওচাই উঠানে বাঁশ পুঁতে, সব আয়োজন সম্পন্ন করে মুরগী কাটে। শিশুর মঙ্গলকামনায় মন্ত্রোচ্চারণ চলতে থাকে। পাশাপাশি হাতও চলে। সবাই ওচাইর ক্রিয়াকার্য দেখছে। ওচাই বলে চলেছে—

মা কাংসারি—
পায়ে পায়ে আনন্দ মধুর
ঝনন ঝনন বাজে কাসার ঘুঙুর।।
মা নাকাটি
ঝিলি মিলি ঝিলি আঁকাবাঁকা
রূপে রূপে অপরূপ রূপা।
মা বাংবারি—
টলোমলো তটিনী তোমার
শোভে অনুপম উপহার।।
মা হাংগারি—
দু'কূলে ছড়ায়ে কালো কেশের মাধুরী
তৃষিত হৃদয়ে দিয়েছো অমৃতবারি।।
মা সনতুই
উড়ু উড়ু বুক জুড়ে
কৃষ্ণনীল ওড়না ওড়ে।।
মা ক্রাকতুই—
উদাস সুরে বাঁধন হারা
আপন বেগে পাগল পারা।।
মা খেরওয়াই—
তরঙ্গে, তরঙ্গে অপরূপ নেশা
সোহাগ বিধুর ভালোবাসা।।
দেখেছি ভোরের মাটি, মায়াবী বাতাস
অস্তাচলে আবির আকাশ
দীনজন আমি, মুরগী দিনু
লহো, লহো, খুশী মনে।।
চোঙে পানি, থালে ভরা ভাত

ভোজন করিয়া করো আশীর্বাদ।।
সম্মুখে জ্বলিছে আলোকবর্তিকা
শিশু প্রাণে জ্বালো অনন্ত প্রদীপ শিখা।।
হাঁটি, হাঁটি পা পা চলন জানে না
সম্মুখে আবার ঢাল পাহাড়, আঙিনা।।
পিচ্ছিল পতনে কোলে নিও তারে
মুছে দিও তার ব্যথা সোহাগ—আদরে।।
প্রবল উচ্ছ্বাসে ভাসাও মাটির ঢেলা
সোনার ফসলে ভরো সন্তানের থালা।
খুশী মনে তুলে নাও এই স্বর্ণবাটি
সোনার ফসলে সন্তানের গৃহ করো পরিপাটি।।
টঙ ঘরে বড়ো খাড়া উঠার সিড়িঁটা
মচকালে হাতে পায়ে দিও মোরে ওষুধ, ঈশিতা।
টাক্কলের খেলা পাহাড়ী শিশুদের সাজে
ভয়হীন, প্রেরণা জাগায় সর্বকালে।।
অবগাহনের ঘাটে কখনো তলায় যদি পাহাড়ী ছড়ায়
মুমূর্ষু শিশুকে বাঁচাও তোমার করুণাধারায়।।
দৃশ্য।। ত্রিশ
স্থান—সাংসি, উঠান।
সময়—অপরাহ্ন

চারদিকে অভাবের চিহ্ন। মাটিতে ভাঙ্গা গলসাই। উঠোনোর কোণে কউরাংফা একটা বেতের ঝুড়ি বানাচ্ছে। তার স্ত্রী পাশে বসে বন আলুর খোসা ছাড়াচ্ছে। জরকা অনেকদিন পর বাঁশী বের করেছে। সাংসিতে পা ঝুলিয়ে বসে বাঁশী পরিষ্কার করে। সাজেরুঙ ঘরের ভেতর বাচ্চাকে দোলনায় রেখে দোল দিচ্ছে। খোলা দরজা দিয়ে ওকে দেখা যায়। জরকামুনি বাঁশি বাজানো শুরু করে। প্রকৃতিও শুকিয়ে খট খট করছে। শুকনো মাঠ, শুকনো গাছ।

(বাঁশী রসুর করুণ)

উঠোনের কোণায় হাতের কাজ করে চলেছে স্বামী, স্ত্রী।

কউরাংফা—মেয়েটার এখন ভালো খাওয়ার প্রয়োজন।

স্ত্রী—আমাদের এরকম এক, আধ দিন না খেয়ে অভ্যাস আছে। কিন্তু মেয়েটাকে না খাওয়ালে বাচ্চাটা বাঁচবে কি করে।

কউরাংফা—সেটাই তো ভাবছি বৌ। কথা শেষ করে কউরাংফা উঠে দাঁড়ায় বেরিয়ে যায়। স্ত্রী তাকায় চারদিকে দেখে শূন্য মুরগীর ঘর। স্বামীর যাওয়ার দিকে আনমনে চেয়ে থাকে।

(বাঁশীর সুর)

দৃশ্য।। একত্রিশ

স্থান—জঙ্গল

সময়—দুপুর

শুকনো গাছ সব দাঁড়িয়ে। বেশ কিছু মহিলা মাটি খুঁড়ছে। ওদের মধ্যে সাজেরুঙ ও তার মা রয়েছে। অত্যন্ত দ্রুত সবার হাত চলছে। ক্যামেরা কাছে গিয়ে দেখবে সাজেরুঙ মাটি খুঁড়ছে। তার পাশে একটি বাচ্চা ও মাটি খুঁড়ছে। মহিলারা খুঁড়ছে। দু'টো ন্যাংটো বাচ্চা ছুটছে। সাজেরুঙ খুঁজছে। পাশে তার মা। তিনিও মাটি খুঁড়ে চলেছেন। সাজেরুঙের হাত আলুর শেকড় ধরে টান মেরে বার করে এনে মাকে ডাকে।

সাজেরুঙ—মা, মা, আলু পেয়েছি।

মা এগিয়ে এসে দেখে, অন্যেরা একবার দেখে হাত দ্রুত চালায়।

ন্যাংটো ছেলে দুটো উঁচু জায়গা থেকে পরে যায়। (আবহসংগীত প্রথম থেকে চলবে, বাঁশীর সঙ্গে, সারিন্দা ও ট্রামপেটে)।

দৃশ্য।। বত্রিশ

স্থান—সাংসি

সময়—অপরাহ্ন

শিশুটি কউরাংফার কোলে কাঁদছে। কউরাংফা ওকে নিয়ে সাংসিতে হাঁটছে আর এদিক ওদিক দেখছে। হঠাৎ সে দেখতে পায় তার স্ত্রী ও সাজেরুঙ উঠোনে ঢুকছে। ওদের দেখেই সে তাড়াতাড়ি সাংসি থেকে নেমে যায়। মা ও মেয়ে কাছে এলে তিনি বাচ্চটিকে সাজেরুঙের কোলে দিয়ে স্ত্রীর পেছনে পেছনে ঘরে ঢোকেন।

দৃশ্য।। বত্রিশ (ক)

স্থান—টঙের ভেতর।

সময়—অপরাহ্ন

ক্ষুধার্ত কউরাংফা কলাপাতা নিয়ে উনুন ঘেঁষে বসে থাকে। তার স্ত্রী আলু সেদ্ধ করছে। মাঝে মাঝে পরখ করে দেখছে খাওয়ার উপযুক্ত হয়েছে কিনা।

(ঘুমপাড়ানি সুর)

দৃশ্য।। তেত্রিশ

স্থান—সাংসি।

সময়—অপরাহ্ন

দোলায় ছেলেকে দোল দিচ্ছে সাজেরুঙ। গুণ গুণ করে গানের চেষ্টাও করছে। এমন সময় বেজে ওঠে ঢোল। যার বোল শুধু মৃত্যুর কথা মনে পড়ায়। মৃত্যুর বাজনা শুনে সাজেরুঙ ছেলেকে দোলনা থেকে তুলে বুকে চেপে ধরে। কউরাংফা খেতে খেতে বাইরে এসে দাঁড়ায়। ওরা শব্দ অনুসরণ করে চারদিকে তাকায়। বুঝতে চেষ্টা করে আওয়াজটার উৎস। বাচ্চাকে চেপে ধরে সাজেরুঙ।

(ঢোলের শব্দ)

দৃশ্য।। চৌত্রিশ

স্থান—ছড়া।

সময়—অপরাহ্ণ।

জরকা ছড়ার জলে মাছ ধরার চেষ্টা করছিল। ঢোল ও কান্নার শব্দ মুহূর্তে তার মুখের চেহারা পাল্টে দিল। সে সব ফেলে রেখে টিলা বেয়ে উঠে দৌড় দিল। দৌড়ে সে গ্রামের ভেতর দিয়ে এসে তার বাড়ীর দিকে তাকায়। সাংসিতে শ্বশুর ও সাজেরুঙের কোলে ছেলে দেখে নিশ্চিন্ত হয়। এবার সে শব্দ অনুসরণ করে ছুটতে থাকে।

(ঢোল, কান্না)

দৃশ্য।। পঁয়ত্রিশ

স্থান—ঘরের ভেতর।

সময়—অপরাহ্ণ

ঘরের মধ্যে একটি মৃতদেহ। মৃতের মা বিলাপ করছে। মৃতদেহটি ঘিরে গ্রামবাসীরা দাঁড়িয়ে। মৃতদেহকে ঘিরে শুরু হয় নৃত্য। দু'জন মৃতদেহের ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে নাচে। বাজতে থাকে ঢোল ও বাঁশী। সঙ্গে মায়ের কান্না। মৃত্যুর দূতদের ওচাই বলে—

যে অন্যায় করে প্রাণ হরণ করে তাকে অভিশাপ দিচ্ছি।

এই মোরগের মতো যেন যন্ত্রণা পায়।

আমার কথা টিলার মাটিতে মিশে হারিয়ে যাবে না।

আগুনেও পুড়বে না এই অভিশাপ।

নলজরে প্রাণ হরণকারীকে, ভুগতে হবে, ভুগতে হবে।

গ্রামের আরো অসুস্থ মানুষ।

মৃত্যুদূতের নৃত্য।

ধাই কাজ করতে করতে অসুস্থ হয়ে পরে।

মৃত্যুদূতের নৃত্য চলছে। জরকা দৌড়ে দরজা দিয়ে ঢোকে। ও মৃতের মুখের দিয়ে তাকিয়ে দেখে এটি তারই বন্ধু। জরকার চোখে জল। তার মনে পড়ে যায় পুরানো কোন ঘটনা। তার খুব কষ্ট হয়। 'সামাফ্রি বাঁচানাম' নৃত্য চলতে থাকে। এর সঙ্গে Inter cut হয়ে দেখা যায়, আরো অসুস্থ মানুষ।

দৃশ্য।। ছয়ত্রিশ

স্থান—গ্রামের পথ

সময়—প্রাক সন্ধ্যা

মৃতদেহ নিয়ে গ্রামবাসীরা গ্রামের ভেতর দিয়ে চলেছে। ওদের মধ্যে জরকামুনি রয়েছে সবার আগে, হাতে বাঁশের আগায় বাধানো একটুকরো সাদা কাপড় নিয়ে, মৃতদেহের সঙ্গেও চলেছে ঢোল বাদক ও বাঁশী বাদকেরা।

(ঢোল ও বাঁশী)

দৃশ্য।। সাঁইত্রিশ

স্থান—শ্মশান

সময়-—প্রাক্ সন্ধ্যা

একটি চিতা সাজানো হলে মৃতদেহ রাখা হলো। আগুন দেয়া হলো।

(মৃদু ঢোলের শব্দ, ওর সঙ্গে আগুনের কাঠ পোড়ানোর শব্দ)

চিতা জ্বলছে। জরকা বিষন্ন মনে দাঁড়িয়ে। এবার একটু জোরে ঢোল ও বাঁশীর শব্দ শোনা যায়। জরকা একটু উঁচুতে দাঁড়িয়ে গ্রামের দিকে তাকায়। শূন্য গ্রাম। জরকা চিতার দিকে দেখে, আগুন।

গ্রামে অসুস্থদের মধ্যে আরো একটি মৃত্যু। মৃতদেহ নিয়ে মিছিল। মৃত্যু। শ্মশানে চিতা জ্বলছে। একটি চিতা। দুইটি চিতা। অনেক চিতা। সমস্ত পাহাড় যেন জ্বলছে। চিতার আগুনে লাল হয়ে গেছে আকাশ। (মৃত্যুর বাজনা ধীরে, ধীরে, fade হয়ে আগুন কাঠ পোড়ানো আওয়াজ জোরে হবে।

দৃশ্য।। আটত্রিশ

স্থান উঠোন।

সময়—সকাল।

জরকা ও সাজেরুঙ ওদের ব্যবহার্য জিনিষ নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। সাংসির নীচে কউরাংফা, তার স্ত্রী, রংকারাই, তার স্ত্রী ও চৌধুরী ও অন্যান্য প্রতিবেশীরা দাঁড়িয়ে। জরকা ও সাজেরুঙ পেছনে খাড়া, বিছানা ও বাচ্চা নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে দাঁড়ায়।

কউরাংফা—বড় কষ্ট পেয়েছ রাঙাজামাই। এই সময় বাচ্চা নিয়ে এখানে থাকলে বড় চিন্তা হয়—

কউরাংফার স্ত্রী পিঠা খাড়ায় রাখে। জরকামুনি প্রথমে কউরাংফা ও তার স্ত্রীকে প্রণাম করে। পরে সাজেরুঙ বাবাকে প্রণাম করে। মাকে প্রণাম করে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে। মাও কাঁদে।

মা—যাও মা। সবাইকে নিয়ে সুখে থেকো।

জরকার মা—এখানকার অবস্থা এমন ভয়াবহ না হলে ওদের নির্দিষ্ট সময়ের আগে নেয়ার কথা ভাবতে হত না।

জরকার শ্বশুর নীরবে তাকায়। গ্রামবাসীরাও সব নীরবে ওদের গাঁয়ের শেষ অব্দি পৌঁছে দেয়। গাঁয়ের শেষ সীমানায় ওদের যাত্রাপথের মঙ্গল কামনা করে ডিম ফাটিয়ে পূজা দেয় ওচাই। ওরা চলে যায় পাহাড়ী পথে। কউরাংফা, তাঁর স্ত্রী ও অন্যান্য গ্রামবাসীরা গাঁয়ে ফিরে যায়। পাহাড়ী পথ অতিক্রম করে জরকা, সাজেরুঙ ও তাদের পিতা, মাতা তাদের গ্রামে এসে ঢোকে।

(বাঁশীর সুর ও প্রাকৃতিক শব্দ)

দৃশ্য।। উনচল্লিশ

স্থান—সংরক্ষিত বন

সময়—দুপুর

গভীর জঙ্গলে তিন জোড়া পা হাঁটছে—

(পাতার ওপর হাঁটার শব্দ)

ক্যামেরার উপর দিয়ে লাফ দিয়ে ফরেস্টার ও গার্ডরা একটা গর্তে গা ঢাকা দিয়ে থাকে।

(হাতির ডাক ও মাহুতের শব্দ)

ওরা মাথা উঁচু করে দেখছে, একটি হাতি কাঠ টেনে যাচ্ছে।

(কাঠ টানার শব্দ)

গর্ত থেকে ওরা বেরিয়ে আসে। মহাজন হাতি নিয়ে ওদের কাছাকাছি এসে যায়। (ঐ)

মহাজন—কি ব্যাপার ? আপনারা এখানে ?

ফরেস্টার—আর বলবেন না-বড় সাহেব আসছেন ২/১ টা Case দিতে না পারলে—বড্ড ঝামেলা করে।

(হাতি চলতে থাকে)

গার্ড ইত্যবসরে মাহুতের কাছে গিয়ে ওর থেকে বিড়ি ধরায়।

মহাজন—দেখেন—দুই একটা মানুষ পেয়ে যাবেন। এই চল্। চলি জঙ্গল সাব।

ফরেস্টার—হ্যাঁ , এই চলো।

হাতি ও মাহুতসহ মহাজন ধীরে সুস্থে চলে যায়।

দৃশ্য।। উনচল্লিশ (ক)

স্থান—জঙ্গল

সময়—দুপুর

জঙ্গলের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পনেরো কুড়িজন মানুষ গাছ কাটছে। ক্যামেরা কাছে গিয়ে ওদের মধ্যে জরকা, বিদ্যাজয়, রংকারাইদের দেখায়।

(বাঁশ কাটার আওয়াজ)

গাছের ওপর থেকে একজন গার্ড ওদের দেখতে পায়।

গার্ড—(আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে) ঐদিকে Sir, বহু মানুষ জঙ্গল সাফ করে নিলো।

(গাছ কাটার আওয়াজ)

ফরেস্টার দ্রুত সবাইকে নিয়ে সেইদিকে চললো। ওদের পেছনে থেকে ফরেস্টার ও গার্ডরা এগিয়ে এসে ধরে ফেলে রংকারাইসহ তিনজন বয়স্ক মানুষকে।

ফরেস্টার—শালা হারামির বাচ্চারা—গাছ চুরি ? চল্ ।

জরকাসহ যুবকরা ভয়ে পালায়। ওদের দেখে ফেলে ফরেস্টার।

ফরেস্টার—যা ওদের ধর।

জরকারা জঙ্গলে ছুটছে। পেছনে ছুটছে গার্ড। ওরা একটা নদী ত্রাসে পেরিয়ে যায়। সেই নদী ধীর, স্থিরভাবে মহাজন তার হাতিসহ কাঠের লগ নিয়ে পার হয়। ভয়ে জরকারা ওদের টাক্কল ফেলে আসে। রংকারাইদের ধাক্কা মেরে ফরেস্টার নিয়ে চলে যায়।

(জঙ্গলের স্বাভাবিক শব্দের সঙ্গে হাল্কা বাঁশী মিশবে)

দৃশ্য।। চল্লিশ

স্থান—টঙের ভেতর

সময়—রাত

দোলনায় শিশু। দোলনার একদিকে জরকামুনি ও অন্যদিকে সাজেরুঙ। নিদ্রাহীন ক্লান্ত, উদ্বিগ্ন। শিশুটি কাঁদছে। দোলনায় দোল দিয়ে ওকে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করছে সাজেরুঙ।

(কান্না ও ঝিঁঝির শব্দ)

সাজেরুঙ—এখন কি করবে ভেবেছ কি ?

জরকা—(বিষন্ন সুরে) বাবাকে ছাড়িয়ে আনতে হবে। আমাদের বেঁচে থাকতে হবে। এসব কিছুর জন্য টাকার প্রয়োজন।

সাজেরুঙ—সে তো ঠিক। টাকা জোগাড় করা এই পাহাড় থেকে কি আর সম্ভব?

জরকা—সে কথাই তো চিন্তা করছি। পাহাড় ছাড়ার সময় হয়ে এলো এবার।

সাজেরুঙ—কি আর করা যাবে। অন্ততঃ এই শিশুটার জন্য আমাদের বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে হবে।

জরকা—সে আমি জানি। কথা হলো কি ভাবে ?

সাজেরুঙ—কেন পরিশ্রম করে।

জরকা—যে পাহাড়ীটার টাক্কল নেই তার তো জোরও নেই। কাজ করব কি?

সাজেরুঙ—যে কাজে টাক্কাল লাগে না-তাই করতে হবে।

জরকা—পাথর ভাঙ্গা।

সাজেরুঙ চুপ করে থাকে।

জরকা—বেশ। কাল সকালে তারই চেষ্টা করবো।

দোলনায় বাচ্চা ঘুমিয়ে পরে। তবুও জরকা ও সাজেরুঙ দোল লাগায়।

দৃশ্য।। একচল্লিশ

স্থান—ইট ভাট্টা

সময়—বিকেল

জরকামুনি ইট ভাটায় ট্রলিতে করে কাদা নিয়ে ফেলেছে। সাজেরুঙ অন্য মহিলা শ্রমিকদের সঙ্গে কাঁচা ইট শুকোতে দিচ্ছে। ট্রাকে ইট লোড হচ্ছে। চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। আকাশ কালো হয়ে গেছে। সমস্ত জায়গা জুড়ে এক কর্মব্যস্ততা। সূর্য ঢলছে। শ্রমিকরা সব লাইন দিয়ে দিনের মজুরি নিয়ে যায়। জরকামুনি ও সাজেরুঙ দশ টাকা করে ওদের পারিশ্রমিক নেয়। ওরা চলতে থাকে। সূর্য সামনে। লাল সূর্য।

সাজেরুঙ—ওহ্ ভীষণ কষ্ট।

জরকামুনি—ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করতে হলে তো কষ্ট করতেই হবে-খাচুকতি।

জরকামুনি বাঁ হাতে সাজেরুঙকে ধরে এগিয়ে চলে সূর্যের দিকে। সূর্য।

তথ্য সূত্র ঃ

আমার জীবন	চার্লি চ্যাপলিন
ফিল্ম সেন্স্	সার্গেই আইজেনস্টাইন
দ্য সাইকোলজি অফ কাম্পোজিশন	সার্গেই আইজেনস্টাইন
অ্যানাদার সিনেমা ফর অ্যানাদার সোসাইটি	গাঁস্তো রর্বেজ
দি ওয়েজ অফ ফিল্ম স্টাডিস	গাঁস্তো রর্বেজ
সিনেমার কথা	গাঁস্তো রর্বেজ
বাইসাইকেল থিভস্	লুইজি মার্তোলিনি
আওয়ার ফিল্ম দেয়ার ফিল্ম	সত্যজিৎ রায়
আওয়ার কালচার দেয়ার কালচার	অমর্ত্য সেন
চলচ্চিত্রের অভিধান	সম্পাদনা. ধীমান দাশগুপ্ত
দি সিনেমা অফ সত্যজিৎ রায়	চিদানন্দ দাশগুপ্ত
ঋত্বিক	সুরমা ঘটক
সিনেমা সময় সমাজ	সম্পাদনা - রজত রায়, সোমেশ্বর ভৌমিক
নাগবিকের পঞ্চাশ বছর	ঋত্বিক মেমোরিয়াল ট্রাস্ট
দেখা সিনেমা ঃ সিনেমা দেখা	শমিক বন্দ্যোপাধ্যায়
ম্যাস্কুলা ফেমিনী	জঁ লুক গোদার (অনুবাদ সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়)
একালের রক্তকরবী	বিশেষ চলচ্চিত্র সংখ্যা
অল এবাউট ফটোগ্রাফি	অশোক দিলওয়ালি
হিউম্যান বিহেভিয়ার	সুনিল কুমার পান্ডা
সিনেমার ভালোমন্দ	সোমেশ্বর ভৌমিক
আইজেনস্টাইন	দিলীপ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
সিনেমার কথা	গাঁস্তো রর্বেজ
ফেদেরিকো ফেলিনি একটি ছবির জন্ম ও অন্যান্য -	মনফকিরা প্রকাশনা